বাঙালির মুকুট

অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়

আজকাল

বাঙালির মুকুট
Bangalir Mukut
an essay on Nobel Laureate Md Younus
bt Arundhati Mukhopadhaya

প্রথম প্রকাশ

কলকাতা বইমেলা ১৪১৩
জানুয়ারি-২০০৭

প্রচ্ছদ

দেবব্রত ঘোষ

ISBN 81-7990-075-4

© লেখক

প্রকাশক
জ্যোতিপ্রকাশ খান
আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
বি পি-৭, সেক্টর ৫, সল্টলেক
কলকাতা-৭০০০৯১

মুদ্রণ
ইউনিক কালার প্রিন্টার
২০-এ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

পরিবেশক
দে বুক স্টোর
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

এ বই হাতে পেলে
বাবা, মা খুশি হতেন

জানা, জানানো

প্রায় ছাব্বিশ বছর ধরে খবরের পেছনে ছুটছেন অরুন্ধতী মুখার্জি, কয়েক ঘণ্টার নোটিসেই যে-কোনও জায়গায় যেতে পা বাড়িয়ে প্রস্তুত। মুহাম্মদ ইউনূস এবং তাঁর গ্রামীণ ব্যাঙ্ক সম্পর্কে আরও জানার ও জানানোর আগ্রহ থেকেই আজকালের চিফ অফ ব্যুরো লিখেছেন এই বই। আশা, পাঠক-পাঠিকারা সাগ্রহে গ্রহণ করবেন।

অশোক দাশগুপ্ত

এ কাজের সময়ে এঁদের সঙ্গে না পেলে কাজটা ঠিকমত হত না। তাঁদের ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করব না কিন্তু উল্লেখ করা প্রয়োজন।

- ড. মুহাম্মদ ইউনূস
- মুহাম্মদ ইউনূসের ভাই মুহাম্মদ জাহাঙ্গির
- গ্রামীণ ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজার নূরজাহান
- মুহাম্মদ ইউনূসের একান্ত সচিব মির আখতার হোসেন
- গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ইন্টারন্যাশনাল প্রোগ্রাম অফিসার গোলাম মোরশেদ মোহম্মদ
- গ্রামীণ ব্যাঙ্কের প্রিন্সিপাল অফিসার এম ডি মুসলেউদ্দিন
- গ্রামীণ ব্যাঙ্কের জোবরার শাখা ম্যানেজার গোলাম মোস্তাফা
- গ্রামীণ ব্যাঙ্কের জোবরার এরিয়া ম্যানেজার জাকারিয়া হাবিব
- মুহাম্মদ ইউনূসের স্কুলের সহপাঠী আবদুস শাকুর

- কলিমাজানি থেকে অসলো ১০
- জোবরা ও শান্তির সেনাপতি ২০
- সহযোদ্ধা ৩০
- নোবেল গরবিনী ফিরোজাও ৩৭
- সাফল্যের জাদুদণ্ড ৪১
- বেড়ে ওঠা ৫৮
- যাঁদের গল্প শুনে এসেছি ৬৪
- কী করে প্রসার ৭৯
- দারিদ্র্য, গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ও বিশ্বব্যাঙ্ক ৮৫
- সেদিন ঢাকায় ৯২
- তাঁর সাক্ষাৎকার ৯৫
- দুষ্টু ছেলের বিশ্বজয় ১০০

যেসব বইয়ের সাহায্য নেওয়া হয়েছে :
Bangladesh, the Pioneer of Microcredit
Social Business Enterprise : Muhammad Younus
Hunger, Poverty and the World Bank : Muhammad Younus
Gramin Bank : As I see it :Muhammad Younus
Faces of Poverty : Editor : Muhammad Younus and Roushsan Ara Rahaman

গ্রামীণ ব্যাঙ্ক পরিচিতি : মুহাম্মদ ইউনূস

নোবেল পুরস্কার হাতে অধ্যাপক মহম্মদ ইউনূস।

কলিমাজানি থেকে অসলো

টাঙ্গাইলের কলিমাজানি গ্রাম থেকে নরওয়ের অসলো সিটি হল। ভূগোলের মানচিত্রের নিরিখে দূরত্ব অনেক। কিন্তু টাঙ্গাইলের গোড়াই মির্জাপুরের রৌশনারা বেগম সে দূরত্ব জয় করেছেন গ্রামীণ ব্যাঙ্কের দৌলতে। অসলো সিটি হলের ঝকমকে সভাকক্ষে পৃথিবীর ধুলোমাখা পায়ে গাঁয়ের ন'জন ১০ ডিসেম্বর (২০০৬) ঢুকে পড়েছিলেন। হাসিনা আখতার, শ্রীহট্টের রুকমা বেগম, নারায়ণগঞ্জের রহিমা বেগম, যশোরের আরতি রানী ঘোষ, বরিশালের ফরিদা বেগম, রাজশাহির তসলিমা বেগম, বগুড়ার হাসিনা বানু, দিনাজপুরের আসমা বেগম ও মাত্র ক্লাস সিক্স পর্যন্ত পড়া রৌশনারা বেগম। আর পাঁচটা বাঙালির মতো গড়পড়তা উচ্চতা। কিন্তু সেই মহিলা আকাশ ছুঁয়েছেন। দারিদ্র্যকে জয় করেছেন। ২০০৬-এ পেলেন তার স্বীকৃতি। অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস তাঁদের হাত ধরে শিখিয়েছেন কী করে ভীরুতা কাটিয়ে জিতে নিতে হয় জীবন। তাই রৌশনারা বেগম অসলো সিটি হলে রোশনাই এনে দিয়েছেন বাকি আটজন গাঁয়ের মহিলার সঙ্গে। ১০ ডিসেম্বর সভাকক্ষে প্রথম সারিতে বসে নরওয়ের রাজা, রানী, যুবরাজ, যুবরানী, স্পেনের রানী, সৌদির যুবরাজ এরকম আরও কত আলোকিত নাম। দ্বিতীয় সারিতেই এক বুক দুরদুরুনি নিয়ে বসে ছিলেন বাংলাদেশের গাঁয়ের 'নবরত্ন'। রাজা, রানীর আলোর পাশে এই সব মাজা মাজা রঙের অল্পশিক্ষিত মহিলারা অসলোর সিটি হলে একটুও বেমানান ছিলেন না। কারণ তাঁরা গিয়েছিলেন নোবেল পুরস্কার নিতে। বরং তাঁরা ম্লান করে দিয়েছিলেন জন্মসূত্রে যাঁরা পেয়েছেন রাজত্ব। দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে তাঁরা রাজা-রানীর মতো বিক্রমে বসে ছিলেন অসলোর সভাকক্ষে। শ্রেণী বৈষম্যের কঠিন বাস্তবকে হারিয়ে তাঁরা সেদিন এক অপরূপ ছবি ফুটিয়ে তুলেছিলেন। সেই প্রথম। সেই প্রথম নোবেল জয়ের ইতিহাসের অধ্যায়ে অল্প-শিক্ষিতদের ঢুকে পড়া, যাবতীয়

শ্রেণীচেতনার মুখে কালিঝুলি লেপে। সভাকক্ষে ছিল অজস্র ফুল। তার সুগন্ধ। রৌশনারা জানেন না তাদের নাম। তবে আন্দাজ করি প্রজাপতির মতো ক্ষীণজীবী ফুলেরা আলগোছে ফুটে ছিল। আলোর ঝাড়ে আলোময় করে দিয়েছিল সভাকক্ষ। সে যেন পৃথিবীর দৃশ্য নয়। কিন্তু সে পৃথিবীরই দৃশ্য। বাংলাদেশের গ্রাম থেকে লড়াই করে রাজা-রানীদের সঙ্গে বসে পড়ার দৃশ্য। সভাকক্ষের ঝাঁ চকচকে পরিবেশে, পরিশীলিত মানুষের বাছাই জমায়েতে ন'জন বাঙালি গাঁয়ের মহিলা তাঁদের সুগন্ধ ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। গ্রামের ছাপোষা জীবনযাপন থেকে বেরিয়ে এসে তাঁরা সেদিন জড়ো হয়েছিলেন স্বপ্নরাজ্যের আমন্ত্রণে। স্বপ্নের পুরস্কার নিতে।

কীভাবে? তা দেখতে চলে গিয়েছিলাম টাঙ্গাইলের গোড়াই মির্জাপুরের রৌশনারা বেগমের কাছে। টাঙ্গাইল পর্যন্ত বেশ গিয়েছিলাম। পাকা রাস্তা ধরে। তারপর কলিমাজানি গ্রামে কাঁচা মাটির রাস্তা। ভাগ্য ভাল শীতকাল। তাই মেঠো পথ শুকনো, খটখটে। কোনওরকমে এঁকেবেঁকে ট্যারাবাঁকা, উঁচুনিচু রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলল হলুদ ট্যাক্সি। গ্রামীণ ব্যাঙ্কের গোড়াই মির্জাপুর শাখায় বলা ছিল আমি যাব। তাই রৌশনারা তৈরি। পাটভাঙা শাড়ি পরে, ম্যাচিং ব্লাউজ, পায়ে চটি। কলিমাজানি গ্রামে ঢুকতে দেখেছিলাম হলুদ সর্ষে খেত। সেরকমই একটা হলুদ শাড়ি পরেছিলেন রৌশনারা। ঘরে ঢুকতেই রৌশনারা আমাকে তাঁদের পরিষ্কার বিছানায় বসতে দিলেন। চৌকি নয়, কাঠের সুদৃশ্য কাজ করা খাট। তার ওপর কালচে লাল রঙের ফরাস পাতা। রুপোলি অ্যালুমিনিয়ামের টিনের বাড়ি। রোদ পড়ে ঝকঝক করছে। উঠোনে সূর্যাস্তের রঙের গাঁদা ফুল ফুটে। আমগাছ, পেয়ারাগাছ। খড়ের গাদা। রৌশনারার প্রতিবেশীও গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সদস্য। তাঁর বাড়ি পেরিয়ে রৌশনারার বাড়িতে যেতে হয়। তাঁর বাড়িতে মেহগনি কাঠের আসবাব তৈরি হচ্ছে। মেহগনিতে সব সময়েই আবলুস রং পড়ে। এই প্রথম দেখলাম মেহগনি কাঠ একটু লালচে। আমি রৌশনারাকে জিজ্ঞেস করি তাঁর গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সদস্য হওয়ার কাহিনী। গরিবি জয়ের গল্প।

সেটা ১৯৮৮ সাল। রৌশনারা ছিলেন নিজের ঘরে। তাঁর স্বামী গিয়েছিলেন মাটি কাটতে। দিন আনি, দিন খাই অবস্থা। সোহাগপাড়া বাজার তাঁদের বাড়ি থেকে এক কিলোমিটার দূরে। মাটি কেটে ফেরত আসার সময়ে সোহাগপাড়া বাজার দিয়েই আসতে হয়। স্বামী মহম্মদ লিয়াকত ছুটতে ছুটতে বাড়ি এসে হাঁপাতে হাঁপাতে রৌশনারাকে বললেন,

— গ্রামীণ ব্যাঙ্কের স্যারেরা এসেছে। স্কুলে জমায়েত হওয়ার জন্যে তাঁরা মাইকে প্রচার করছেন। তুমি শিগগির যাও।

ততদিনে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের একটু-আধটু নাম হয়েছে। রৌশনারা ছুটলেন সোহাগপাড়া বাজারে। মাথা ঢাকা দিয়ে। তখন তাঁদের অভাব অনটনের সংসার। মাত্র পনেরো-ষোল বছর বয়সে রৌশনারার বিয়ে হয়েছে। তিনি তখনও

কলিমাজানি থেকে অসলো-রৌশনারা বেগম।

অল্পবয়সী একটা মেয়ে। শ্বশুর, শাশুড়ি, ননদ, দেওর মিলে ছ'জনের সংসার। আছে তাঁর ছোট্ট ছেলে। একবেলা খাওয়া জুটত কী জুটত না। আটার রুটি। কিংবা আটা গোলা। বাড়ির চাল দিয়ে জল পড়ে। মেঘ মানেই ভয় এই বুঝি ঘর জলে থইথই। স্বামীর একটা লুঙ্গি। ভিজে গামছা পরে লুঙ্গি কেচে শুকোতে দেন। আর রৌশেনারার পরবার মতো শাড়ি একটাই। অন্যটায়, তিনি গুনেছিলেন মোট সতেরোটা ফুটো। সেই ছিদ্রওলা, ছিন্ন শাড়ি পরে তিনি কেচে দেন মোটামুটি পরার শাড়িটিকে। তারপর আবার গায়ে জড়িয়ে নেন সেই শাড়ি। এখন সেই রৌশনারার ঠোঁটে গোলাপি লিপস্টিক। চোখে কাজল। মেয়ে পরিয়ে দিয়েছে। মেয়ের পরনে জিনস। তাতে এমব্রয়ডারি করা। আর কুর্তি। ছেলের গায়ে টকটকে লাল ফুলহাতা টি শার্ট। ১৯৮৫ সালে রৌশনারার বিয়ে হয়েছে। '৮৮-তে তার আঠারো-উনিশ বছর বয়স। বাপের বাড়িতেও অনটন। অনেকগুলো বোন। তাই বাবা আর এক অভাবীর বাড়িতে বিয়ে দিয়ে কোনওরকমে একটা মেয়ে 'পার' করলেন। রৌশনারা স্বামীর কথা শুনে সোহাগপাড়া বাজারে গেল। গিয়ে শুনল বাজারের লাগোয়া স্কুলমাঠে জমায়েত হতে হবে। রৌশনারা স্কুলমাঠের দিকে এক ছুট লাগাল।

গ্রামীণ ব্যাঙ্কের 'স্যারেরা' তাঁদের বললেন, আপনারা পাঁচজন করে দল করুন। আর সপ্তাহে দু টাকা করে সঞ্চয় গ্রামীণ ব্যাঙ্কে দিন, ঋণ নিন। তারপর রৌশনারার শুরু হল কলিমাজানি গ্রামে আর চারজনকে খোঁজা। সে বড় সহজ কাজ নয়। এ হতে চায় তো তার স্বামী হতে দেয় না। কেউ নিজেই হতে চায় না। অজানা ঋণের থেকে যেন চেনা অনটন ভাল! কিন্তু রৌশনারা অত সহজে ছেড়ে দেওয়ার পাত্রী নন। গ্রামের ঘরে ঘরে গিয়ে আঠারো-উনিশ বছরের রৌশনারা খুঁজে আনলেন আশিয়া, বাসিরন, ফুল খাতুন আর জরিনাকে। সেবার ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশে ভয়াবহ বন্যা হয়েছে। সারা দেশ জুড়ে। তাদের গ্রামও ভেসে গিয়েছিল। ভেসে গিয়েছিল তাদের ঘর। মাটিপথ হয়ে গিয়েছিল নদীপথ। কলার ভেলায় করে তারা যাতায়াত করেছে। এই অবস্থায় অভাবের ঘরে সামান্য সঞ্চয়ও রাজার ঘরের বিলাস। কিন্তু রৌশনারা পাঁচজনকে নিয়ে দল বেঁধে ফেললেন। রৌশনারা খানিকটা হলেও পড়েছেন বলে সই করতে জানেন। গ্রামীণ ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিতে গেলে বা সঞ্চয় করলে সই করতে জানা বাধ্যতামূলক। রৌশনারা বাংলায় সই করলেন। আশিয়া, ফুল খাতুনরা? তাঁর দলের আর চার সঙ্গী? গ্রামীণ ব্যাঙ্কের স্যারেরা হাতে ধরে ওঁদের সই করা শেখালেন। আ-শি-য়া এই তিন অক্ষরের ওপর বারেবারে কলম বোলানো চলল। তার আগে শেখানো হল কলম ধরার কায়দা। তারপর তাঁরা ঋণ পেলেন। রৌশনারা এক হাজার টাকা, আশিয়া পনেরশো টাকা, বাসিরন এক হাজার, ফুল খাতুন দু হাজার, জরিনা এক হাজার টাকা ঋণ নিলেন। দিলেন সঞ্চয়ের প্রথম কিস্তি। প্রত্যেকে প্রত্যেকের ঋণের সাক্ষী

রইলেন। রৌশনারা দুশো টাকা মনের ধান পাঁচ মন কিনলেন। ধান ভিজিয়ে সেদ্ধ করে চাল তৈরি করলেন। এবার আর মহাজনের কাছে বেগার খাটা নয়। হাটে গিয়ে চাল বেচে এলেন রৌশনারা। সেদিনের চালওয়ালি, আজকের সিটি হল আলো করা নোবেল বিজয়ী। কয়েকবার হাটে গেলেন। তিনশো টাকা করে লাভ হল প্রতিবার। প্রতি সপ্তাহে। ঋণ শোধ করে দিলেন এক বছরে। বাড়ির ছিরি ফিরতে লাগল একটু করে। পরের বছর তিন হাজার টাকা ধার নিলেন। ধান কিনে চালের ব্যবসা চলল। সঙ্গে কিনলেন একটা বাছুর। কম টাকা দিয়ে বাছুর কিনে পালন করে শুরু করে দিলেন দুধের ব্যবসা। হাটে গিয়ে চাল বিক্রি, আর সকালে বাড়ি বাড়ি গিয়ে দুধ বিক্রি। সংসারে দু'পয়সা আয় হতে লাগল। কিন্তু ঘরের বউ হাটে যাচ্ছে চাল বেচতে? গ্রামে যারা তখনও গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সদস্য হয়নি তাদের কটূক্তি হজম করতে হত। কিন্তু রৌশনারা বললেন, 'গ্রামের ধনীরা এক হাজার টাকায় ছশো টাকা সুদ নেন। তা-ও সে ধার আমাদের দেন না। আমরা গরিব। যদি ফেরত না দিই।' কিন্তু তিনি ছোটখাট ব্যবসা করেন, ছোট ছোট লাভ হয় আর অল্প অল্প করে সুদসমেত টাকা ফেরত দেন গ্রামীণ ব্যাঙ্ককে। তাঁর ছিল মাটির ঘর, খড়ের ছাদ। এই আঠারো বছরে তাঁর তিনখানা ঘর। ছাদ দিয়ে আর জল পড়ে না। বর্ষায় কী বা ভয়! ওঁর টিনের ঘর। ঘরও করেছেন গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ঋণে। এমনি ঋণে হাজার টাকায় দুশো টাকা দিতে হয় বছরে। গৃহঋণে রৌশনারা আট শতাংশ হারে সুদ দেয়। দশ বছরের দীর্ঘমেয়াদি ঋণ। তারপর নিলেন মরশুমি ঋণ। দশ হাজার টাকা। নিজের খেতে এবার নিজে ধান চাষ করা। স্বামী আর মাটি কাটতে যান না। ট্র্যাক্টর দিয়ে ধান চাষ করেন। সারা বছর চাল কিনতে লাগে না। আটা গোলা খাওয়ার দিন শেষ। আঠারো বছরে আরও ঋণ নিলেন। পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে এবার শুরু করলেন মাছের চাষ। নিজস্ব পঁচিশ কাঠা জমি কিনলেন, আর পঁয়ষট্টি কাঠা জমি লিজে নিলেন। এ হল ধান চাষের। ট্র্যাক্টর দিয়ে যে ধান চাষ শুরু করলেন তার জন্য ট্র্যাক্টর ভাড়া দিতে হত। পাশাপাশি শুরু হল মাছ চাষ। তেলাপিয়া, কাতলা, রুই আর সিলভার কার্প। ভোর চারটেয় উঠে মাছ ধরান। তারপর আড়তে বিক্রি। আমি জিজ্ঞেস করি, পুকুর কই? ঘর থেকে বেরিয়ে অদূরে আঙুল তুলে দেখালেন, ওই তো পুকুর।

আমি জিজ্ঞেস করি, মাছ চুরি হয় না?

— গ্রামে শান্তি আছে। মাছ চুরি হয় না। এই তো দেখুন না পাশের বাড়ির গাছে কত পেঁপে ঝুলে আছে। একটাও কেউ নেবে না। এমনকি বাচ্চা ছেলেরাও নেয় না। আমার বাড়িতে গরমে গাছ ঝাঁপিয়ে আসে আম, বর্ষায় পেয়ারা। কেউ পাড়ে না। আমরা যখন মাছ তুলি সেদিন গ্রামের সব বাড়িতে মাছ দিই। গরমে আম দিই। অন্যরাও তাদের গাছের জিনিস আমাদের দেয়। চুরির ব্যাপার নেই।

ওঁর বাড়িতে রঙিন গাঁদারা হাসছে। আমি ভাবলাম কলকাতায় আমাদের

বাড়ির সেই একটুকরো বাগানের কথা। আমাদের পাড়ায় উচ্চশিক্ষিত, মধ্যশিক্ষিতের অভাব নেই। কিন্তু কয়েকটা গাঁদা, জবা, টগর, অপরাজিতার জন্যে আমাদের বাড়ির সামনের গেটে তালা লাগিয়ে রাখতে হয়! বড় লজ্জা হল। এই অতি অল্পশিক্ষিতরা যেমন ধার নিয়ে সুদ সমেত কড়ায় গন্ডায় সব ধার শোধ দেন, তেমনি তাঁরা অন্তরে এত শিক্ষিত যে জানেন অন্যের গাছের জিনিসে হাত দিতে নেই। এ রাজ্যে অন্যের পুকুরে ফলিডল ফেলে মাছ মেরে দেওয়ার খবর আসে মাঝে মাঝে। কলিমাজানি সেই ক্ষুদ্র চৌহদ্দির বাইরে শান্ত ছোট গ্রাম।

আমি রৌশনারাকে জিজ্ঞেস করি, আপনি খুশি? রৌশনারার মুখে আনন্দের রোশনি। গোলাপি লিপস্টিক দেওয়া ঠোঁট দুটি ছড়িয়ে হেসে বললেন,

— মেয়ের জন্যে গয়না কিনে রেখেছি। আমার বিয়ের সময়ে বাবা বেশি কিছু দিতে পারেনি, দিয়েছিল শুধু কানের ফুল আর রুপোর চেন। এই দেখুন না আমি গড়েছি বালা, ঝোলা দুল, চেন।

— ছেলের জন্যে?

— কিনে দিয়েছি মিউজিক সিস্টেম।

— ওরা কী পড়ে?

— ছেলে মোহম্মদ খোকন পড়ে ক্লাস টেনে, মেয়ে শিরীন আখতার পড়ে ক্লাস এইটে। স্কুল পর্যন্ত মেয়েদের পড়াতে কোনও মাইনে লাগে না। তা ছাড়া ভাল ফল করতে পারলে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক সদস্যদের ছেলে-মেয়েদের স্কলারশিপ দেয়। স্কলারশিপের পঞ্চাশ শতাংশ মেয়েদের জন্যে, আর বাকি পঞ্চাশ শতাংশ ছেলে-মেয়ে সবার জন্যই সুযোগ খোলা।

— কী খান?

— ভাত, ডাল, সবজি। সবজির মধ্যে বেগুন, পেঁপে, শিম, আলু তো আছেই। মাছ কিনতে হয় না। দু'বেলা মাছ খাই। সপ্তাহে একদিন মাংস। এখন সংসারে আমরা পাঁচজন। আমার স্বামী, আমি, ছেলে, মেয়ে, শাশুড়ি।

আমি ওঁর কাছ থেকে সপ্তাহের বাজার খরচের ফর্দটা চেয়ে নিলাম।

মুরগির মাংস:	দু কেজি
পেঁয়াজ:	এক কেজি
আলু:	দু কেজি
তেল:	এক কেজি
চিনি:	আড়াইশো গ্রাম

মরিচ, নুন, নানারকম মশলা কিনতে হয়। চাল, মাছ কেনার প্রয়োজন পড়ে না। অন্যান্য সবজি বাড়িতেই হয়। রৌশনারার ছেলেমেয়ে, গ্রামের বাচ্চাদের জন্যে বাড়িতে সবসময়ে রাখা থাকে চানাচুর-বিস্কুট।

আমি জিজ্ঞেস করি, বছরে ক'টা শাড়ি কেনেন।

তাঁর জবাব, 'উৎসবের সময়ে শাড়ি, জামাকাপড় কিনতে হাজার দুয়েক টাকা খরচ হয়।' হঠাৎ তাঁর মোবাইলটি বেজে উঠল। মোবাইলও আছে? নম্বর: ০১৭১১৫১১৫৮৯।

— হ্যাঁ, মোবাইলের ব্যবসা করি। এ গ্রাম থেকে ফোন করতে গেলে সোহাগপাড়া বাজার যেতে হয়। অনেকে হাঁটতে চান না। কেউ কেউ নিরিবিলিতে কথা বলতে চান। এখানে এখন গ্রামীণ ব্যাঙ্কের দৌলতে ছেলেমেয়েরা পড়াশুনো করে। কারও স্বামী বাইরে থাকে। বাজারে গিয়ে কথা বলতে অনেকেই থতমত খেয়ে যান। তাঁদের আমি ফোন দিই। আমার বাড়ি থেকে ফোন নিয়ে যান বা এখানে এসে ফোন করেন।

এ হল গ্রামীণ ফোন। গ্রামের লোকেরা বলেন পল্লী ফোন।

১৯৯৭ সালে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সদস্য দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করছিলেন এমনই একজন মহিলা সাইনি বেগম, পল্লী ফোনের উদ্বোধন করেন। তখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন শেখ হাসিনা। শেখ হাসিনার সঙ্গে কথা বলে পল্লী ফোনের উদ্বোধন হয়। আমি রৌশনারাকে বলি অসলোর নাম আগে কোনওদিন শুনেছেন? রৌশনারা মাথা নামিয়ে সলজ্জ হাসি হাসেন। তারপরই মুখে আলোর ঝলক।

— আমার এই ফোনে খবর এল। নোবেল পুরস্কার নিতে অসলো যেতে হবে। সেই অনেক দূরে মেমসাহেবদের দেশে। আমার তো বিশ্বাস হয় না। আমি স্যারকে বলি, কী বলছেন, সত্যি? সেই স্যার আমাকে বললেন, আপনার ভাগ্য খুলে গেছে। আপনি বিদেশ যাবেন। আমার তখনও যেন বিশ্বাস হয় না। তারপর গ্রামীণ ব্যাঙ্কের শাখা ম্যানেজার বললেন, আপনি বিদেশ যাচ্ছেন। ঢাকা থেকে বলেছে।

ঢাকার মিরপুরে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সদর দপ্তর।

— তারপর স্যার বললেন ছবি লাগবে। পাসপোর্ট হবে। সোহাগপাড়া বাজারে গিয়ে ছবি ওঠালাম। সেই প্রথম আমার ছবি তোলা। আমার আত্মীয় থাকেন টাঙ্গাইলে। তাই গ্রামের বাইরে গেছি সেই আত্মীয়ের বাড়ি। আর গ্রামীণ ব্যাঙ্কের বোর্ড বৈঠক করতে তিনবার গেছি ঢাকায়।

টাঙ্গাইলের গণ্ডির বাইরে এই প্রথম রৌশনারা পা দিলেন। এরপর? অসলোর উদ্দেশে। না। তার আগে আছে এক বিরাট প্রস্তুতি। রৌশনারা সুতি কাপড়, সায়া, ব্লাউজ এ-সব কিনলেন। তারপর ঢাকার মিরপুরে গ্রামীণ ব্যাঙ্কে। গ্রামীণ ব্যাঙ্ক 'নবরত্ন' সভার মহিলাদের দিল দুটো জামদানি, সায়া, ব্লাউজ, ইনার, ওভারকোট, ট্রাউজার, টুপি, মাফলার, গ্লাভস, মোজা, জুতো। তাঁদের দেখিয়ে দেওয়া হল সে-সব কোনটা কীভাবে পরতে হয়। প্রতি বছর ডিসেম্বরে ইউরোপের সব থেকে উত্তরের দেশ নরওয়ের রাজধানী অসলোয় সাধারণ তাপমাত্রা থাকে হিমাঙ্কের নিচে। শুধু হিমাঙ্কের নিচেই নয়, রীতিমতো মাইনাস ২০ থেকে ২৫-৩০

ডিগ্রি সেলসিয়াস। সাদা বরফে সব কিছু ঢেকে যায়। এবার ডিসেম্বরের প্রথম দেড় সপ্তাহ অসলোবাসীর গত পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসে সব থেকে উষ্ণ সময় ছিল। তিন থেকে ছ' ডিগ্রি সেলসিয়াস। রৌশনারা যখন অন্য আটজনকে নিয়ে নামলেন তখন তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার শীতের ভেতর সন্ধের পরই নামল গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। মুহাম্মদ ইউনূসকে ধরে মোট আটাত্তর জন গিয়েছিলেন অসলোয়। রৌশনারার সঙ্গে ছিলেন গ্রামীণ ব্যাঙ্কের পরিচালনা বোর্ডের আর এক সদস্য চাঁপাই নবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার ধাইনগর গ্রামের মহিলা তসলিমা বেগম।

তসলিমার উঠে আসার গল্প রৌশনারার মতোই উজ্জ্বল। ধাইনগর বা ধনিগর গ্রামে গরিব পরিবারের মেয়ে। পড়েছেন ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত। ১৯৯২ সালে তিনি গ্রামীণ ব্যাঙ্কের শিবগঞ্জ শাখার সদস্য হন। এ পর্যন্ত পনেরো দফা ঋণ নিয়েছেন। শাকসবজি ও হাঁসমুরগি পালন করেন। এক বিঘে জমিতে আম বাগান। এখান থেকে বছরে আসে পঁচিশ-তিরিশ হাজার টাকা। গত নভেম্বরে কানাডায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ক্ষুদ্র ঋণ সম্মেলন ২০০৬-এ শ্রেষ্ঠ সৃজনশীল উদ্যোক্তা হিসেবে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন পিরোজপুরের বিন্না গ্রামের নিলুফার ইয়াসমিন। তাঁর উঠে আসার গল্পটিও একই রকম। ক্ষুদ্র ঋণই এঁদের জীবনে বাতি দেখিয়েছে।

তাঁরা যেহেতু সবাই গ্রাম থেকে এসেছেন, কোনওদিন বাইরে যাওয়ার সুযোগ মেলেনি তাই তাঁদের প্রশিক্ষণের জন্য গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ওয়ার্কশপের আয়োজন করে। আমাদের শহুরে চোখে সেই ওয়ার্কশপ ভ্রূ তোলার অবকাশ দেয়। কিন্তু চিরকাল গ্রামে থাকা, অল্পশিক্ষিত মেয়েদের জন্যে তা ছিল নিতান্ত জরুরি। যেমন, কীভাবে ট্রাউজার পরে হাঁটতে হবে, হোটেলে গরম জল, ঠান্ডা জল কীভাবে মেশাতে হবে, ব্যবহার করতে হবে। হোটেলের লবিতে কীভাবে হাঁটতে হবে। বিমানে উঠে কীভাবে সিট বেল্ট বাঁধতে হবে এরকম আরও কত খুঁটিনাটি। গ্রামীণ ব্যাঙ্কের উচ্চপদে আছেন দীপালচন্দ্র বড়ুয়া। সেই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন মুহাম্মদ ইউনূস পড়াতেন তখন থেকে দীপালচন্দ্র বড়ুয়ার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা। তিনি অসলোয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক প্রতিনিধিদের জন্য বাঙালি রান্নার ব্যবস্থা করেন। সেই অনুযায়ী সবাইকে প্রাতরাশ, মধ্যাহ্নভোজ, নৈশভোজের টোকেন দেওয়া হয়েছিল।

অসলোয় গিয়ে ওয়ার্কশপে শেখা সব কিছুই ঠিকমতো রূপায়ণ করতে পেরেছিলেন রৌশনারা। তাঁদের থ্যাঙ্ক ইউ, হাউ ডু ইউ ডু, নাইস টু মিট ইউ শিখিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আর শেখানো হয়েছিল ওয়াটার, টি এই সব অতি প্রয়োজনীয় ইংরেজি শব্দ। সভাকক্ষে কোথায় ওভারকোট খুলতে হবে, ড্রেসকোড কী হবে সব প্রাঞ্জল করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল। গাড়ির দরজা খোলা, গাড়ির ভেতর ঢোকা, বসা ইত্যাদি সব কিছুর পাঠ নিয়েছিলেন তাঁরা। আমি তাঁর বাড়িতে যেতেই রৌশনারা আমাকে হাত বাড়িয়ে বলেছিলেন, হাউ আর ইউ। তাতেই বুঝেছিলাম তাঁরা প্রশিক্ষণ নিতে পেরেছিলেন ঠিকঠাক। ভোলেননি কিছুই। তাঁর

সব থেকে আশ্চর্য লাগছিল যখন সিটি হলে বক্তৃতা হচ্ছে আর তিনি হেড ফোনে পুরো অনুষ্ঠান বাংলায় তক্ষুনি তক্ষুনি শুনছেন। ওই গ্রামে তাঁর বন্ধু রাবেয়া গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সদস্য। গত বছর বোর্ড সদস্য ছিলেন। রৌশনারা নোবেল পুরস্কার আনতে যাচ্ছেন বলে তিনি খুশি। কিন্তু মনে কি একটুও আক্ষেপ নেই। 'গত বছর যদি গ্রামীণ ব্যাঙ্ক নোবেল পেত তবে আমি পুরস্কার আনতে যেতাম।'

তাতে রাবেয়ার দুঃখ নেই। রাবেয়ার জন্যে রৌশনারা ছোট্ট উপহার এনেছেন। সবার জন্যে যেটুকু পারেন উপহার এনেছেন।

তিনি যেদিন ফিরলেন সেদিন সারা কলিমাজানি গ্রাম ভেঙে পড়েছিল তাঁকে দেখতে। তিনি ছোটদের হাতে তুলে দিয়েছেন চকোলেট আর মহিলাদের হাতে সাজগোজের জিনিস। স্বামী লিয়াকত আলির জন্যে জ্যাকেট। ছেলেমেয়েদের জন্যও জামাকাপড়। রৌশনারা খুশি হয়েছেন ছোট ছোট উপহার এর-ওর হাতে তুলে দিয়ে। যাইহোক না কেন তিনিই এ গাঁয়ের একমাত্র যিনি বিদেশ গিয়েছিলেন। এখন এ গাঁয়ে যাঁরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সদস্য হননি তাঁরা সব রৌশনারার কাছে যাচ্ছেন, 'সদস্য করে দাও।' গ্রামীণ ব্যাঙ্কের প্রসার বাড়ছে। তাঁর ভাল লেগেছিল যেদিন তিনি অসলো পাড়ি দিচ্ছেন। সারা গাঁয়ের সব লোক, ছেলেমেয়ে, পড়শি তাঁর পিছু পিছু হেঁটে সোহাগপাড়া বাজার অবধি তাঁকে পৌঁছে দিল। সকালের বাসে তিনি কলিমাজানি গ্রাম ছেড়ে যাচ্ছেন। শীত তেমন পড়েনি। তখন রুপোলি রোদে চরাচর জুড়ে এক আনন্দের বিদায় জানানোর ছবি ফুটে উঠেছে। তিনি বাসে উঠলেন। সবাই হাসিমুখে বিদায় জানালেন রৌশনারাকে। স্বামী, ছেলে, মেয়েও। গরিবের ঘরের মা, গরিবের ঘরের বউ আজ দিগ্বিজয়ী। হারিয়ে যাচ্ছে পুরনো জগৎ। সরে যাচ্ছে চেনা রাস্তা, চেনা হাট, গাছের সারি। ক্রমে অচেনার দিকে বাস ঘুরে গেল। সবাই হাত তুলেছে আবার এসো ফিরে। এভাবেই কলিমাজানি গ্রাম রৌশনারাকে অসলোর পথে বিদায় জানিয়েছিল।

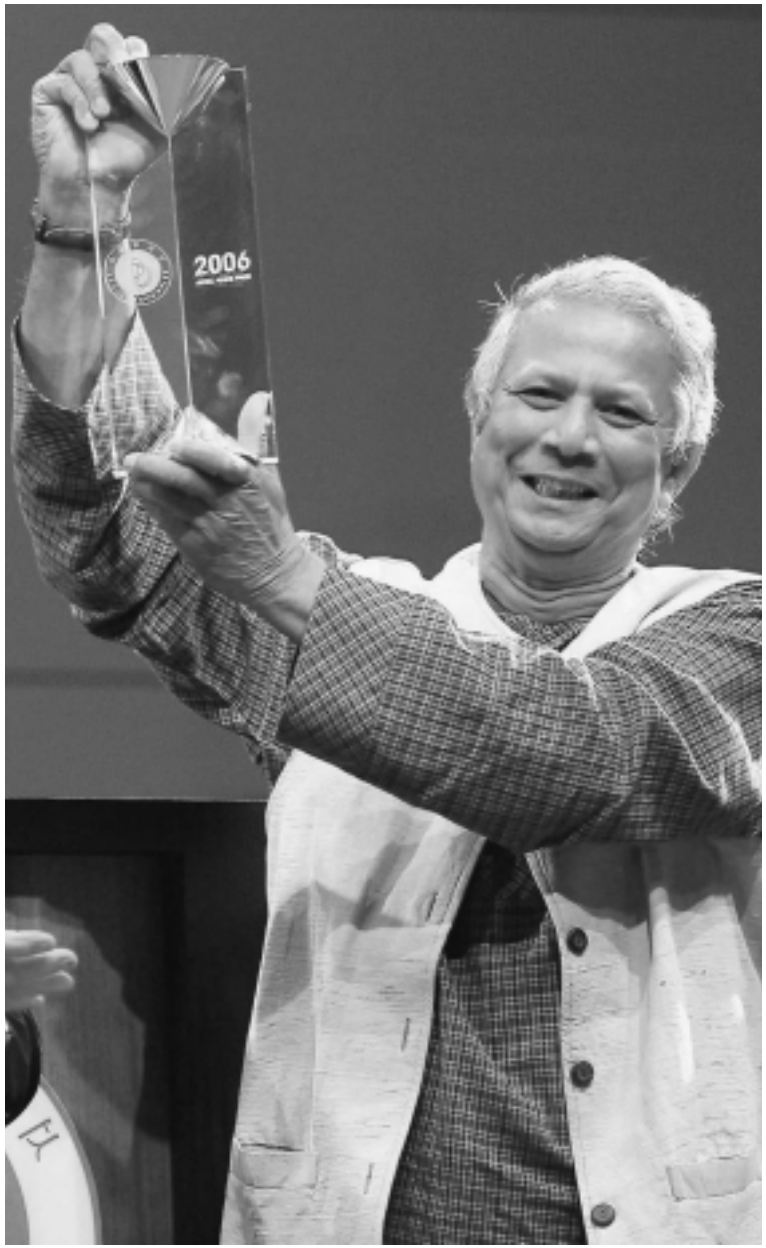

সিওল শান্তি পুরস্কার হাতে।

জোবরা ও শান্তির সেনাপতি

চট্টগ্রামের বন্দর শহর থেকে জোবরা যেতে হয়। জোবরা হল সেই গ্রাম যেখান থেকে মুহাম্মদ ইউনূস শুরু করেছিলেন দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে তাঁর জয়যাত্রা। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করার সময়ে এই জোবরা গ্রামেই তিনি বিয়াল্লিশ জনকে আটশো ছাপ্পান্ন টাকা নিজের পকেট থেকে দিয়ে শুরু করেছিলেন তাঁর ক্ষুদ্র ঋণ বিপ্লব। এই মুহূর্তে জোবরা গ্রামের সব থেকে বড় বৈশিষ্ট্য হল এ গ্রামে কোনও ভিখিরি নেই। এখানকার গ্রামীণ ব্যাঙ্কের শাখা অফিসে ঢুকলেই চোখে পড়বে একটি ছোট্ট স্লোগান। স্লোগান ছোট, অর্থ গভীর।

ভিক্ষা নয়
ঋণ নেব
আয় করে
ফেরত দেব।

জোবরা গ্রামে বাস করেন চার হাজার পাঁচশোটি পরিবার। তার মধ্যে পাঁচশো পরিবারের অবস্থা এমন নয় যে তাঁরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ঋণ পেতে পারেন। অর্থাৎ, গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ঋণ পেতে গেলে যে রকম দরিদ্র হতে হয় তাঁদের আয় তার ওপরে। গ্রামীণ ব্যাঙ্কের নিয়মই এরকম যে প্রতি পরিবারের একজনই মাত্র গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সদস্য হয়ে ঋণ নিতে পারেন। ১৯৭৬ সালে এখানে ক্ষুদ্র ঋণ শুরু হয়। ঠিক তিরিশ বছরে জোবরা গ্রামের প্রতি পরিবারের একজন করে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সদস্য। অর্থাৎ, চার হাজার জন জোবরায় গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সদস্য। জোবরার প্রত্যন্ত অঞ্চলেও পৌঁছে গেছে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক। এখানে ভিখিরিদেরও সদস্য করা হয়েছে। তারা ছেড়ে দিয়েছে ভিক্ষে করা। আনোয়ারা বেগম আর জ্যোৎস্না এরা এখন আর হাত পাতে না। আনোয়ারা পান-সুপুরির ব্যবসা করে। আর জ্যোৎস্না মুড়ি, মোয়া, বিস্কুট বিক্রি করে। ওরা দু'জনেই প্রথমে নিয়েছিল এক হাজার টাকা। পরে ঋণ

শোধ হলে নেয় দু-হাজার টাকা। ভিখিরি হলে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক তাদের বিনা সুদে ঋণ দেয়। কিন্তু গ্রামীণ ব্যাঙ্ক এমনভাবেই তার চরিত্র প্রোথিত করেছে যে ভিখিরিরাও টাকা শোধ করে ঋণের পরিমাণ পরের কিস্তিতে বাড়িয়ে নেয়। আমাদের দেশের পাঁচতারা মহামানবরা যদি এই 'ভিখিরি'দের কাছ থেকেও কিছু শিক্ষা নেন তবে দেশের উপকার হত! তবে কলিমজানি গ্রামে ভিখিরি সদস্য মানেকা বেগমের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তার স্বামীর অসুখ। দুটো ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। ঋণ নিয়ে বাছুর কিনেছে। তাকে পালন করছে। আর শাকসবজি ফিরি করে। তাতে চলে না। এখনও সে ভিক্ষে করে। সে আমাকে কথা দিয়েছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সে ভিক্ষে করা ছেড়ে দেবে।

জোবরা গ্রামের 'বিখ্যাত' ভিখিরি সুফিয়া খাতুনের নাম অনেকেই জানেন। মুহাম্মদ ইউনূস এই গ্রামের জারিনাকেও ভিক্ষাবৃত্তি থেকে টেনে তুলে এনেছেন। জারিনাকে বাধ্য হয়ে ভিখিরি হতে হয়েছিল। জারিনা চেয়েছিল কী করে ভিক্ষাবৃত্তি এড়িয়ে চলা যায়। পারেনি। তার জীবনে শুধুই ছিল সংগ্রাম। মাত্র ন' বছর বয়সে তার বিয়ে হয়। বছর দুয়েক বাদে তার স্বামী মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়ে তার যেটুকু সম্পত্তি ছিল তা হারায়। স্বামী পরিবার ছেড়ে, বাড়ি ছেড়ে কোথায় যেন চলে যায়। বছর ছয়েক ধরে জারিনা শ্বশুরবাড়ির ভিটেতেই পড়ে ছিল। কিন্তু তার দেওর তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চাইলে সে আর সহ্য করতে না পেরে তার কাকার কাছে চলে আসে। এক বছরের মধ্যে তার আবার বিয়ে হয়। কিন্তু তার দ্বিতীয় স্বামী ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর। স্বামীর হাতে মার খাওয়া ছিল জারিনার নিত্যদিনের ব্যাপার। দ্বিতীয় স্বামীও জারিনাকে ছেড়ে চলে গেল। তখন জারিনার দুই মেয়ে। দুই মেয়েকে নিয়ে জারিনা আবার ফিরল তার কাকার কাছে। এবার কাকা আর তিনজনকে খাওয়াতে রাজি হল না। জারিনার প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও তার তৃতীয়বার বিয়ে হল। এবারও তার পরিণতি একই। স্বামী তাকে ছেড়ে পালাল। টুকরো-টাকরা জিনিস দিয়ে ছোট ছোট জিনিস বানিয়ে সে নিজের আর দুই মেয়ের টিকে থাকার জন্যে লড়াই চালাচ্ছিল। এরকম এক কঠিন লড়াইয়ের সময়ে তার দ্বিতীয় স্বামী ফিরে এল। কিন্তু স্বামী সাহায্য করার বদলে, আয় করার বদলে জারিনার বোঝা হয়ে উঠল। দুই মেয়ে, স্বামী নিয়ে সে কোনও মতেই আর দিন চালাতে পারে না। জারিনা পথে নেমে ভিক্ষে শুরু করল। ভিক্ষের টাকা দিয়ে সে চারজনের জন্যে কিছু না কিছু খাবার কিনত আর চেষ্টা করত যৎসামান্য কিছু সঞ্চয় করার। কোরানের ভেতর সে তার সামান্য সঞ্চয় লুকিয়ে রাখত।

এই সময়েই গ্রামীণ প্রকল্পের কথা তার কানে এস। তার প্রথমে ধারণা ছিল ধার নিলে বোধহয় তাকে কেউ মারধর করবে, জেলে নিয়ে যাবে কিংবা তার সামান্য ঝুপড়িতে আগুন ধরিয়ে দেবে। কিন্তু সে দেখল গ্রামের অন্য মহিলারা ধার নিচ্ছে। বেশ তো সহজ! ধার নাও, কাজ কর, শোধ দাও। তখন জারিনাও সাহস

সঞ্চয় করে একদিন গুটিগুটি পায়ে এল গ্রামীণ প্রকল্পের স্যারেদের কাছে। স্যারেরা বলেন, পাঁচজনের একটা দল কর আর প্রতি সপ্তাহে নিজেদের মধ্যে বসে কথা বল। ব্যাঙ্কেরই একজন ম্যাডাম আসবেন ওদের সঙ্গে কথা বলতে। তারা সারা সপ্তাহে যা সঞ্চয় করবে তার একটা টাকা দেবে প্রকল্পে। সঞ্চয় হিসেবে। আর সেই সঙ্গে যে টাকা সে নিয়েছে তা প্রতি সপ্তাহে কিস্তিতে শোধ দেবে। জারিনা সেই ম্যাডামের সঙ্গে কথা বলে ভরসা পেল। জোবরায় সে আরও চারজনকে খুঁজে দল গড়ল। তারপর সে-ই হল দলের চেয়ারম্যান।

প্রথম দফায় জারিনা নিল আড়াইশো টাকা। মুদি দোকানের জিনিসপত্র কিনে সে বেচতে শুরু করল। সাপ্তাহিক কিস্তিতে সে টাকা পরিশোধও করল। কোনও সমস্যা হল না। তার সাহস গেল বেড়ে। প্রথম ঋণ শোধ হওয়ার পর সে দ্বিতীয়বার ঋণ নিল। এবার টাকার পরিমাণ চারগুণ। এক হাজার টাকা ঋণ নিয়ে সে এবার পুরোপুরি কেনাবেচার পেশায় চলে গেল।

তার মেয়েরা ততদিনে বড় হয়েছে। সে তার প্রথম সন্তানকেও ঋণ নেওয়াল। তার মেয়ে প্রথমে নিল দুশো টাকা। ফেরত দিল। তার পরের বার সে নিল আটশো টাকা।

জারিনা এবার হয়ে উঠল আত্মবিশ্বাসী। বাড়িতে রোজ দু'বেলা খাবার আসতে লাগল। তার কুঁড়েঘর ছাওয়া হল যাতে আগামী বর্ষায় জল না পড়ে, শীতের কনকনে হাওয়া যাতে আটকানো যায়। সে আর ভিখিরি নয়।

জারিনার মতো জোবরায় আরও ছোট দল ছিল। দল গোষ্ঠীবদ্ধ হয়েছিল চট্টগ্রামের হাতাজড়ি থানার বিভিন্ন গ্রাম থেকে। এরকম আশিটি দল তৈরি হয়েছিল। এই সব দুর্ভাগা মহিলার বেশিরভাগেরই স্বামী পালিয়ে গেছে বা তালাক দিয়েছে। এই সব দলের প্রায় একাশি জন গ্রামীণ প্রকল্প থেকে টাকা নিয়ে বাঁশের কাজ শুরু করল, সাতচল্লিশ জন ছোটখাট জিনিস কিনে আশপাশের গ্রামে বেচত, ১৭৬ জন গরু কিনে দুধের ব্যবসা, এগারো জন ধান থেকে চাল সিদ্ধ করা, ১৩৮ জন গরু-ছাগল পোষা, তিনজন কুটির শিল্প, বারো জন মহিলা মুদি ব্যবসা আর মণিহারি দোকান দিল। এরা মিলিতভাবে ছ লক্ষ টাকা ধার নিয়েছিল। সাপ্তাহিক কিস্তিতে টাকা শোধও দিয়েছে। এরা সবাই মিলে পঞ্চান্ন হাজার টাকা জমিয়েছে। এই টাকা থেকে আবার তারা যে কেউ ঋণ নিতে পারে। তবে ঋণ নেওয়ার আগে তার দলের চারজনের সম্মতি নিতে হবে।

মহিলাদের মতো যাঁরা ভূমিহীন কৃষক তাঁরাও গ্রামীণ প্রকল্প থেকে ঋণ নিয়েছিলেন। তার জন্য তাঁদের কিছু সম্পত্তি আমানত রাখতে হয়নি। গ্রামীণ ব্যাঙ্ক যখন গ্রামীণ প্রকল্প হিসেবে জোবরায় চলছিল তখন তেরটি গোষ্ঠী তৈরি হয়। আটশো তিন জন ঋণগ্রহীতা পনেরো লক্ষ টাকা ঋণ নেন। এতজনের মিলিত সঞ্চয় ছিল এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা। এরা ছোটখাট ব্যবসা, কৃষি, ছোটখাট

জিনিস তৈরিতে টাকা খাটিয়ে উপায় করত।

জোবরা গ্রামের রহিমা বেগম বলেছেন, 'আমাকে আগুন জ্বালানোর কাঠকুটুরি সংগ্রহ করতে হত। চট্টগ্রামের পার্বত্য এলাকায় চড়াই উতরাই পেরিয়ে এ কাজ যেমন ছিল বিপদের, তেমনি পরিশ্রমসাধ্য। এক এক সময়ে আমি এমন ক্লান্ত হয়ে পড়তাম যে মনে হত যেন আর পথ চলতে পারছি না। কিন্তু আমি গ্রামীণ প্রকল্পের কথা শুনে এক হাজার টাকা ধার করে গরু কিনলাম। দুধ বিক্রি করে আমি ধার শোধ দিতাম। তা ছাড়া দিনে দেড় টাকা রোজে কাজ করতাম পানের বরজে।'

কল্পনার ছিল পাঁচ মেয়ে। তাদের বিয়ে দিয়ে দেওয়ার মতো সাধ্য ছিল না কল্পনার। গ্রামীণ প্রকল্প থেকে টাকা নিয়ে পানের ব্যবসা শুরু করে 'আমার আর আমার পাঁচ মেয়ের খাওয়া জুটত।'

সাবিরন লোকের বাড়ি কাজ করত। কিন্তু তা দিয়ে তার আর তার তিন মেয়ের খাওয়া জুটত না। সে ভিক্ষে শুরু করল। কিন্তু গ্রামীণ প্রকল্প তাকে একশো টাকা ধার দিল। একশো টাকায় শুঁটকির ব্যবসা শুরু করল সাবিরন। যে-সব বাড়িতে সে ভিক্ষে করতে যেত সে-সব বাড়িতেই সাবিরন গেল এবার শুঁটকি বিক্রি করতে। এতদিন যারা তাকে দেখলে 'দূর দূর' করত, এখন তারাই পিঁড়ি এগিয়ে দিয়ে তাকে বসতে বলছে। সামান্য ঋণের টাকা এভাবেই সাবিরনের জীবনে মর্যাদা নিয়ে এসেছিল। প্রথম ঋণ শোধের পর সাবিরন নিয়েছিল দ্বিতীয় ঋণ। তখন খেতে পাওয়া তার কাছে কোনও সমস্যা ছিল না। সে তার তিন মেয়েকে নিয়ে দু'বেলা পেটপুরে শুধু খেতই না, মাছ-মাংসও সে বাজার থেকে কিনে এনে রাঁধত।

সুফিয়া হচ্ছে জোবরার প্রথম ভিখিরি যে গ্রামীণ প্রকল্প থেকে ধার নিয়েছিল। এক ঝড়ের দিনে সে ভিক্ষে করতে বেরোতে পারেনি। ভিক্ষের পয়সাও আসেনি। তার খাওয়াও জোটেনি। কিন্তু গ্রামীণ প্রকল্প এসেছিল তার কাছে আশীর্বাদের মতো। মাত্র পঁচিশ টাকা ধার নিয়ে সে সাবান, হেয়ারক্লিপ, বালা, চুড়ি কিনে বিক্রি করেছিল। লাভ হয়েছিল সামান্যই। তবু তা দিয়ে চাল, নুন হয়ে গিয়েছিল। টাকা শোধ দিয়ে সে এবার পঞ্চাশ টাকা ধার নিল। সেই ভিখিরি তখন চেয়েছিল, ভিক্ষে আর নয়।

'আমার নাতি পড়াশোনা শিখে বড় হবে। আমার মতো অশিক্ষিত ভিখিরি হয়ে আমার নাতি বাঁচবে না।'

তার স্বপ্ন সত্যি হয়েছিল। সুফিয়ার ওপর থেকে ভিখিরি তকমা উঠে গিয়েছিল।

জোবরা গ্রামীণ প্রকল্পই প্রথম শিখিয়েছিল, গরিব ব্যাঙ্কের কাছে আসবে না, ব্যাঙ্কই যাবে গরিবের দরজায়। আর ব্যাঙ্ককর্মীরা অফিসে আসবেন শুধু

কাগজপত্র, ফাইল সাজাতে, কাগজপত্র ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বোঝাতে। না হলে তাঁদের অফিসে আসার দরকার নেই। তাঁরা কড়া নাড়বেন গ্রামের মানুষের দোরে।

গোষ্ঠী বা দলের সদস্য হলেই গ্রামীণ ব্যাঙ্ক থেকে ধার নেওয়া যাবে। যখনই তিনি ধার নেবেন তখনই তাঁর ঋণ থেকে গোষ্ঠী বা দল পাঁচ শতাংশ টাকা কেটে নেবে। এর নাম গোষ্ঠী-কর। এই গোষ্ঠী-কর সেই দলের নিজস্ব টাকা। এর থেকে আবার দলের সদস্যরা অন্যের সম্মতি নিয়ে বাড়তি ঋণ নিতে পারেন।

চট্টগ্রামের বেতাগি, রঙ্গুনিয়া হচ্ছে অনুর্বর পার্বত্য এলাকা। গ্রামীণ ব্যাঙ্ক সেখানকার ভূমিহীনদের জন্যে কিছু করার কথা ভেবেছিল। তাঁদের প্রতিষ্ঠা দিতে হবে। অনুর্বর পার্বত্য জমি আর ভুখা পেট— এই দুই সমস্যার সামনে পড়ল গ্রামীণ ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্ক সেই ভূমিহীনদের টাকা ধার দিল। আশ্চর্য। এ যেন জাদু। সেই অনুর্বর জমিতে চাষ করে গাছে ফল এল, মাঠে সবজি এল, সেই সঙ্গে শুরু হল সামাজিক বনসৃজন। ষাটটি ভূমিহীন পরিবার এই এলাকাকে সবুজ, সুন্দর করে তুলল। বেতাগি পার্বত্য এলাকার ২৪০ একর শুখা জমি সবুজ প্রান্তরে পরিণত হল।

গ্রামীণ ব্যাঙ্কের এই সাফল্য দেখে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, কৃষি ব্যাঙ্ক গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সাহায্যে এল। কোনও কোনও ব্যাঙ্ক গ্রামীণ ব্যাঙ্ককে অনুসরণ করল। আরও ব্যাপকভাবে গরিব মানুষ ব্যাঙ্কের কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল। যে-সব মানুষ কোনওদিন ব্যাঙ্ক শব্দটিও শোনেনি, কিংবা ব্যাঙ্ক সম্পর্কে কোনও ধারণা ছিল না, তারা জেনে গেল ব্যাঙ্ক নামে এক জিয়নকাঠির কথা। জোবরায় জয় হল গ্রামীণ ব্যাঙ্কের।

জোবরায় যাঁরা ঋণ নেন তাঁদের অনেকেই বাঁশের কাজ করে আয় করেন। কেন, সেটা জোবরা গেলে আর বুঝতে অসুবিধে হয় না। জোবরায় সার দিয়ে বাঁশগাছ। সবুজ বাঁশ দাঁড়িয়ে আছে ঝাড় ধরে। বাঁশ দিয়ে তাঁরা ঝুড়ি বোনেন। ধান নেওয়ার টুকরি, ডোলা, কুলো... বাঁশের নানারকম কাজ করে এঁরা ঋণ শোধ দেন। কারও কারও বা আছে ছোট মণিহারি দোকান। কাঁটা, ক্লিপ কী ফ্যাশন জুয়েলারি হাটে নিয়ে গিয়ে বেচেন, কেউ বা বেচেন বন্দর-শহরে। কারও বা আছে ছোট চায়ের স্টল। ধান থেকে চাল তৈরির কাজ গ্রামে অনেকেই করেন। কেউ বা তরিতরকারি বেচেন। শুটকির ব্যবসায় হাত লাগিয়েছেন অনেকে। গ্রামীণ ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে জোবরা গ্রামে সব থেকে ধনী হয়েছেন মল্লিকা খাতুন। পঁচিশ বছর আগে মল্লিকার ছিল টানাটানির সংসার। স্বামীর আয়ে দু'বেলা পেটপুরে খাওয়া জুটত না। জোবরা তখন গরিব গাঁ। বেশিরভাগেরই দু'বেলা খাওয়ার সামর্থ্য ছিল না। অথচ বাঁশঝাড়, বেতস, আম-কাঁঠালে সে এক সবুজ গাঁ। বন্দর-শহর চট্টগ্রাম থেকে দূরে নয়। তবু বন্দরে কাজ পাওয়া যেত না। কেমন নিষ্কর্মা দিন যেত। নিঝুম ভাব ঘিরে থাকত চারধার। বন্দরের কাজের কোনও ব্যস্ততাই ছুঁত না জোবরাকে।

তখনই মল্লিকার পড়শি মারিয়া ঋণ নিয়ে ফেললেন গ্রামীণ প্রকল্প থেকে। ইতিমধ্যে গ্রামীণ প্রকল্পের পাশে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সিলমোহর পড়ে গেছে। কিন্তু গ্রামীণ প্রকল্পের কপালে তখনও গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ছাপ পড়া বাকি আছে। মল্লিকাও ছুটল গ্রামীণ প্রকল্পের কাছে। তারা নাকি মেয়েদেরই বেশি ঋণ দেয়। সপ্তাহে দু টাকা সঞ্চয় করতে হবে। আর পাঁচশো টাকা ঋণ। মল্লিকা একটা ছাগল কিনল আর ধান থেকে চাল তৈরির কাজে হাত দিল। সেটা ১৯৮০ সাল। তখন জোবরায় মাত্র পাঁচজন সদস্য। তার মধ্যে তিনজন এখনও বেঁচে আছেন— নূরজাহান, হালিমা, লায়লা। তখন সে গ্রামে রাস্তা ছিল কাঁচা। এখন জোবরা গ্রামে পুরোটাই ইটের রাস্তা। বেশিটা করে দিয়েছে সরকার। আর বাকিটা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সদস্যরা নিজেরা টাকা দিয়ে ইটের রাস্তা করিয়ে নিয়েছেন। মল্লিকা একাই ইটের রাস্তা বানানোর জন্য দু'হাজার টাকা দিয়েছেন। কেউ দিয়েছে পাঁচশো, কেউ বা ছ'শো। এ নিয়ে গ্রামের লোকের মনে কোনও খেদ নেই। কে কম দিল, কে বেশি দিল এ নিয়ে কলকাতার পাড়াতেও ঝগড়া হয়, কিন্তু জোবরা ঝগড়াহীন। মল্লিকার সামর্থ্য বেশি, তাই মল্লিকা বেশি দিয়েছেন! সরল যুক্তি, সহজ অঙ্ক।

জোবরার গ্রামীণ ব্যাঙ্কের শাখা ম্যানেজার গোলাম মোস্তাফা বললেন, 'এখানে যখন প্রথম প্রথম আসতাম একটু বৃষ্টিতেই কাদা থকথকে হয়ে যেত। হাঁটা ছিল ভারি কষ্টসাধ্য। এখন গোয়ালঘরেও ইট বিছানো। এখানে বাড়ি দেখিনি, সব ঝুপড়ি। আমি তখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাকাউন্টেন্সি পড়ছি। টিউশনি করতে জোবরায় যেতাম। আলাউল দিঘির পাশ দিয়ে আলাউল পাড়ায় পড়াতে যেতাম। পা ডুবে যেত কাদায়। এখন এখানে বৃষ্টিকে কেউ ভয় পায় না।'

ঝুপড়ির দিন গিয়েছে। সব গোবরমাটি নিকনো তকতকে বাড়ি। ঝকঝকে, পরিষ্কার। জোবরা গ্রামে এখন অনেকেই আছেন যাঁরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ঋণ নিয়ে কমপ্রেসড ন্যাচারাল গ্যাস-চালিত অটো চালান, কেউবা চালান ভ্যান রিকশা। মল্লিকার ঋণের পরিমাণ এই মুহূর্তে সব থেকে বেশি। আড়াই লক্ষ। তাঁর দুটো গ্যারেজ ও ওয়ার্কশপ আছে। দুই ছেলে দেখাশোনা করেন। মল্লিকার গ্যারেজে কাজ করেন বারো জন। তিনি এখন ওয়ার্কশপের মালকিন। কাজের খুঁটিনাটি দেখার দায়িত্ব ছেলেদের। তিনি সব কিছুর তদারকি করেন। আর খেয়াল রাখেন ঋণ শোধে যাতে কোনও গাফিলতি না হয়। কর্মচারীদের ন্যূনতম মজুরি দিনে একশো টাকা। যে-সব কর্মচারী গাড়ির কাজ ভাল জানেন তাঁদের মজুরি ওঠে দিনে আড়াইশো টাকা পর্যন্ত। তাঁর ঘরে আছে পল্লী ফোন। নিজস্ব। ব্যবসা করার জন্যে নয়। তাঁর ছেলেদের কাছেও আছে গ্রামীণ ফোন। ঘরে নামীদামি ব্র্যান্ডের বড় কালার টিভি, ফ্রিজ আছে। তাঁর পোলট্রির ব্যবসা খুব ভাল চলছিল। কিন্তু মুরগির অসুখের পর বাংলাদেশ জুড়ে এত গুজব ছড়িয়েছিল যে সেই ব্যবসাটা এখন আর

তত জমজমাট নেই। তাই বলে তাঁর অবস্থা পড়ে গেছে এমন নয়। গ্যারেজের ওয়ার্কশপই মল্লিকার প্রধান ব্যবসা। তাঁর বাড়িতে আটজন খান। সঙ্গে সবসময়েই থাকেন কোনও না কোনও অতিথি— কখনও মেয়ে-জামাই, কখনও ভাইপো বা ভাইঝি। তাতেও আপেল, আঙুরে কম পড়ে না। হ্যাঁ, ছেলেরা গ্যারেজ থেকে ফেরার সময়ে বাজার করে আনেন। বাজারে ফল থাকবেই। এখন জোবরায় ঢুকলেই দেখতে পাওয়া যাবে ব্যাডমিন্টনের নেট ফেলা রয়েছে। এ গ্রামের ছেলেমেয়েদের ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেটও আছে! শীত পড়েছে। স্কুল-কলেজ থেকে ফিরে তারা ব্যাডমিন্টন খেলবে। জোবরা দিয়ে মুহাম্মদ ইউনূসের ক্ষুদ্র ঋণের কাজ শুরু, তাই জোবরাই বাংলাদেশের প্রথম গ্রাম যেখানে সব গরিব পরিবারের একজন করে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সদস্য। জোবরা এখন তাঁর কাছে যেন প্রতীক। সেই জোবরার দৃষ্টান্তকে এখনও গোটা বাংলাদেশে ছড়িয়ে দেওয়া বাকি আছে। অধ্যাপক ইউনূস বলেন, '২০১৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশের সব দরিদ্র পরিবারে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ঢুকে যাবে। তাঁর লক্ষ্য স্থির আছে। এখন আটান্নভাগ পরিবার দারিদ্র্যমুক্ত। একে তিনি পুরোপুরি একশো শতাংশে নিয়ে যেতে চান। আর অবশ্যই তার আগে গ্রামীণ ব্যাঙ্ককে পৌঁছতে হবে মানুষের দোরে। এখন আশি শতাংশ দরিদ্র পরিবারে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ঢুকে পড়েছে। আগামী চার বছরের মধ্যে বাকি কুড়ি শতাংশ পরিবারের দরজায় কড়া নাড়বে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক। অর্থাৎ, ২০১৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশ দারিদ্র্যমুক্ত। আর ২০১০-১১ সালের মধ্যে গোটা বাংলাদেশের সব দরিদ্র পরিবারে ঢুকে যাবে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক।' তিনি বললেন, 'আমরা ধীরে ধীরে এগোচ্ছি। প্রথমে জেলা, তারপর উপজেলা, তারপর ইউনিয়ন, ইউনিয়ন থেকে প্রতি গ্রাম, প্রতি গ্রাম থেকে প্রতি পরিবার।'

এমন কোনও গ্রাম নেই যেখানে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক এখনও তার পা রাখতে পারেনি? আছে বৈকি। বঙ্গোপসাগরের মধ্যে নিঝুম দ্বীপ, সন্দীপ, হাতিয়া এ-সব অতি প্রত্যন্ত এলাকায় এখনও গ্রামীণ ব্যাঙ্ক পৌঁছায়নি। কারণটা উদ্যমের নয়, কারণটা ভৌগোলিক। যেমন, নিঝুম দ্বীপ একটা ঘুমন্ত দ্বীপ। কিছু লোক ওখানে থাকেন, খান, বাস করেন হোগলা পাতায় ছাওয়া কুটিরে। এই প্রত্যন্ত অঞ্চল ছাড়া বাংলাদেশের ৭৯ হাজার গ্রামে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ছড়িয়ে আছে। বাংলাদেশের সরকারি হিসেবে অবশ্য ও দেশে গ্রাম আছে ৬৮ হাজার।

এত গ্রামে যে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ছড়িয়ে দিতে পেরেছে তার ডালপালা, তার ম্যাজিকটা কি? কোনও সরকারি পরিকাঠামো ছাড়া কী করে এটা সম্ভব হল? '৭৬-এ মুহাম্মদ ইউনূস জোবরায় যা শুরু করেন তাই প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেল ১৯৮৩-তে। আর আমাদের দেশে মাইক্রো-ফিনান্স বা ক্ষুদ্র ঋণ চালু হয় ১৯৯০ সালে। মূলত সরকারি উদ্যোগে। অনেকটা ইউনূস ধাঁচেই। ছোট ছোট দল গঠন করা হবে, এক পরিবারের একজনই দলে থাকবে, যাঁরা দলের সদস্য হবেন তাঁদের

জমানো টাকা বা সম্পদ নেই, মহিলারাই মূলত দল গঠন করবেন কারণ সমাজে মহিলাদের স্বীকৃতি ও সম্মান কম।

ইউনূস বলেন, 'এ দেশে বা পশ্চিমবঙ্গে স্বনির্ভর দল কাজ করে ব্যাঙ্কের শাখার মাধ্যমে। ওই দলের জন্য দলনেতাই ঋণের ব্যাপারে দায়ী থাকেন। আমরা ওভাবে করি না। দলনেতার মাধ্যমে গ্রামীণ ব্যাঙ্কে কিছু করা হয় না। যে টাকা নেয় সে-ই তার জন্য দায়ী থাকে। গ্রামীণ ব্যাঙ্ক সরাসরি সদস্যদের কাছে যায়। কাজটা সরকারি ব্যাঙ্কের মাধ্যমে হয় না। প্রতি সপ্তাহে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ঋণগ্রহীতার সঙ্গে যোগাযোগ করে। পাঁচজনের দল করে সেখানে যে টাকা নিতে চায় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক তাকে অনুমোদন করেও দেয়।'

গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সুদ কুড়ি শতাংশ। ক্রমহ্রাসমান। কিন্তু সেখানে বাংলাদেশে ব্যাঙ্ক আছে যাদের সুদ ষোল শতাংশ। মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, কুড়ি শতাংশ সুদ নিয়েও আমাদের যে এই প্রসার তার পেছনে কোনও ম্যাজিক নেই। বাংলাদেশে যারা আরও বড় বড় ব্যাঙ্ক বা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা তাদের অনেকের সুদ তিরিশ শতাংশ। আর যাদের সুদ ষোল শতাংশ তারা গরিবকে ঋণ দেয় না। তবে যাই হোক, ওদেরটাও চলে, আমাদেরটাও চলে। মানুষের টাকার দরকার আছে। ষোল শতাংশে তো সে ঋণ পায় না। পেলে সে ভাবত ষোল নেবে না বিশ নেবে? আমাদের টাকা ফেরত দিতে কারও অসুবিধে হয় না, কারণ রোজগার কিস্তির থেকে বেশি। নোবেল পুরস্কার আমাদের আরও অনুপ্রেরণা দিয়েছে। উৎসাহ দিয়েছে। আমরা এখন আর থামব না। সামনে এগিয়ে যাব। যে মানুষের কাছে ঋণ-সুবিধে পৌঁছয় না, তার দরজায় কড়া নাড়ব। তবে আমরা যাই করি না কেন নিজেদের মতে চলব। আমি চিরকালই বলে এসেছি বিশ্বব্যাঙ্কের টাকা নিলে তাদের কথামতো চলতে হয়। কিন্তু এটা আমাদের ব্যাঙ্ক। আমাদের ব্যাঙ্ক চলবে আমাদের কথামতো। তাই বিশ্বব্যাঙ্ক আমাদের বারে বারে ঋণ দিতে চেয়েছে, আমরা নিইনি। তবে আমরা কখনও বৈদেশিক সাহায্য নিইনি তা নয়। ১৯৮২ থেকে ১৯৯৫ আমরা সুইডেন, জার্মানি, কানাডা, জাপান, নরওয়ে, রাষ্ট্রপুঞ্জের সংস্থার কাছ থেকে ঋণ নিয়েছি। আমার পরিষ্কার কথা— 'তোমাদের মত আমাদের ওপর চাপিও না। যদি তোমাদের আমাদের কাজ পছন্দ হয় তা হলে ঠিক আছে। পছন্দ না হলে তোমাদের টাকা যা দিয়েছ ফিরিয়ে নাও। যা দাওনি তা আর দিও না। ১৯৮২ থেকে '৯৫ এই তেরো বছরে আমরা দেড়শো মিলিয়ন আমেরিকান ডলার ঋণ নিয়েছি। অনেকটাই ফেরত দেওয়া হয়ে গেছে। বাকিটাও ফেরত দিয়ে দেব। এরপর আর আমাদের বৈদেশিক সাহায্যের দরকার হবে না। আমরা পুরোপুরি নিজের পায়ে দাঁড়াব।'

আর নোবেল পুরস্কারের টাকায় কি করবেন ইউনূস? 'সামাজিক ব্যবসা। মুনাফা নয়, মানুষের মঙ্গলের জন্য ব্যবসার নামই সামাজিক ব্যবসা। তাতে

লভ্যাংশ পাওয়া যাবে না। হাসপাতাল, পুষ্টি, মাতৃমঙ্গল, শিক্ষা যে-কোনও বিষয় নিয়েই সামাজিক ব্যবসা করা যেতে পারে। মানুষ গান গাইলে যেমন তৃপ্তি পায়, ব্যবসায় তেমন কোনও তৃপ্তিকে স্বীকার করা হয়নি। মুক্তবাজার অর্থনীতির ভেতরে থেকেই এটা বলা যায়। মানুষ ব্যবসা শুধু টাকা উপার্জনের জন্যেই করবে না, করতে পারে মানুষের ভালর জন্যেও। তখন মানুষ চিন্তা করবে তার ব্যবসার মাধ্যমে কতজন মানুষের মঙ্গল সাধন হচ্ছে। এ ধরনের ব্যবসাকেই আমি সামাজিক ব্যবসা বলি। প্রযুক্তি নিয়েও এ ধরনের ব্যবসা হতে পারে। বর্তমান স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে কাজ করতে গেলেই আমরা মুনাফার দিকে ঝুঁকে পড়ব। সামাজিক ব্যবসার ক্ষেত্রে দরকার হবে আলাদা স্টক এক্সচেঞ্জ। যেখান থেকে জানা যাবে কোন সমাজে কোন কাজ করলে সবচেয়ে বেশি মানুষের মঙ্গল হবে। এ-ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াই হবে আলাদা। স্বাস্থ্যখাতে, শিক্ষাখাতে, শিশুদের জন্যে, বৃদ্ধদের জন্যে যে কোম্পানিগুলো এ ধরনের কাজ করবে, আমরা সেই কোম্পানিতে বিনিয়োগ করতে পারি। আমি দুটো সামাজিক ব্যবসার কথা বলতে চাইছি। যার পুঁজি আছে তিনি এমন ব্যবসা করবেন যার মূলে থাকবে মানুষের কল্যাণ। গরিব মানুষের মালিকানায় যদি সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের ব্যবসা পরিচালিত হয় সেটাকেও সামাজিক ব্যবসা বলছি। সেইভাবেই বন্দরের মালিকানা আমরা দরিদ্র মহিলাদের দিয়ে দিতে পারি। এটি হবে মহাবন্দর। তাঁরা মহাবন্দরের মালিক হবেন এবং এ থেকে অর্জিত মুনাফায় তাঁরা লাভবান হবেন।'

সহযোদ্ধা- গ্রামীণ ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজার নূরজাহান।

সহযোদ্ধা

রক্ষণশীল বাংলাদেশে মহিলাদের ঋণ দেওয়া যত কঠিন, তার থেকেও কঠিন কাজ মহিলা কর্মী নিয়োগ। মহিলাদের ঋণ দিতে গেলে তারা বলত,

— আমরা তো বাড়ির বাইরে বের হই না। আপনারা আমার স্বামীকে ঋণ দেন।

কেউ বা বলত বাবা বা ভাইকে ঋণ দেওয়ার কথা। তাঁদের বোঝানোর জন্য মহিলা কর্মী নিয়োগ ছিল জরুরি। গ্রামীণ ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজার নূরজাহান বেগমের কাহিনী শুনলে বোঝা যাবে রক্ষণশীলতার বেড়া ভেঙে কীভাবে তাঁকে কাজ করতে হয়েছে। মুহাম্মদ ইউনূসের নীতিটাই ছিল এরকম: 'বুঝিয়ে কাজ করিয়ে নিতে হবে, জোর-জবরদস্তি করে নয়।' এই হল নূরজাহানের বেড়া ভাঙা নয়, বেড়া টপকানোর কাহিনী। গ্রামীণ ব্যাঙ্ক প্রকল্প যখন শুরু হয় তখন নূরজাহান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এ পড়ছেন। বয়স তেইশ। তিনি ছিলেন রক্ষণশীল, মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। মাত্র এগারো বছর বয়সে হারিয়েছিলেন তাঁর বাবাকে। তাঁর মা চেয়েছিলেন মেয়ে বিয়ে করে ঘর-সংসার করুক। নূরজাহান তা চাননি। তিনি এম এ পড়বেন। চাকরি করবেন। তাঁর গ্রামের মহিলাদের মধ্যে প্রথম এম এ পাস করার কৃতিত্ব তাঁরই। তিনি একটি সংস্থায় চাকরি পেলেন। কানাডার সংস্থা। ভাল কাজ, ভাল বেতন, বিনা পয়সায় ফার্নিশড কোয়ার্টার। কিন্তু তাঁর মা ঘরের মেয়েকে বাইরে রোজগারে পাঠালেন না। বাংলাদেশের অভিজাত হোন বা মধ্যবিত্ত সব পরিবারই রক্ষণশীল। তাঁরা ঘরের মেয়েকে চাকরি করতে পাঠাতে পারেন না। নূরজাহানের চোখের জলে তাঁর মায়ের মন ভিজল না। নূরজাহানের দাদা ততটা অরাজি ছিলেন না, তবে বাইরের লোক, পাড়া-প্রতিবেশী কী বলবে তা নিয়ে তাঁর মনে যথেষ্ট দ্বিধা ছিল। নূরজাহান বারবারই চাকরির তারিখ পাল্টাতে বলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। শেষ পর্যন্ত গ্রামীণ ব্যাঙ্কে আবার তিনি ইন্টারভিউ দিয়ে চাকরি পেলেন। তিনি মা-কে বললেন, — আমি হস্টেলে

ছিলাম তুমি আপত্তি করনি। এবারও আমি মেয়েদের হস্টেলে থাকব। তুমি আপত্তি করবে না। তাঁর মা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নানা প্রশ্ন করলেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহাম্মদ ইউনূসকে তাঁর পরিবার চেনেন। শেষ পর্যন্ত অনুমতি মিলল। কারণ, নূরজাহান টেবিল-চেয়ারে বসে কাজ করবেন!

নূরজাহান বললেন, 'এখন যেমন গ্রুপ কেন্দ্র দেখছেন তখন সেরকম ছিল না। আমরা অনেক সময়ে গাছতলায় বসে মিটিং করেছি। তখন আরও রক্ষণশীল ছিল গ্রামের মেয়েরা। আমি বোরখা পরতাম না, মাথায় কাপড় দিতাম। একটা মেয়ে রাস্তায় ঘুরে ঘুরে কাজ করছে এটা তখন কেউ ভাল চোখে দেখেনি। তখন এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে যেতেও মেয়েদের বাড়ির অনুমতি নিতে হত। আমি বোরখা পরতাম না বলেও আমাকে অনেকে ভাল চোখে দেখত না। খারাপ মেয়ে ভাবত। কটূক্তি করত। আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি তখন মহিলাদের হস্টেলে থাকতাম। আমার ভাইয়া আমাকে হস্টেলে দিয়ে আসত, আবার ফিরিয়ে নিত। আমাদের একা চলার হুকুম ছিল না। একবার স্যার আমাকে কুমিল্লায় একা পাঠিয়েছিলেন। আমি খুব ভয় পেয়ে আমার এক সহকর্মীকে বলি আমার সঙ্গে যেতে। তাঁর সময় ছিল না বলে সে যাত্রায় আমাকে একাই যেতে হয়। সেই থেকে আমি এখন দুনিয়ার যে-কোনও জায়গায় যেতে পারি। তখন একেবারে যারা গরিব মেয়ে তারা ভিক্ষে করত বা লোকের বাড়ি কাজ করত। অন্য মেয়েদের বাইরে ঘোরা লোকে ভাল চোখে দেখত না। আমার কাজ শুধু গ্রামের মহিলাদের ঋণ দেওয়া ছিল না, আমাদের তাদের বোঝাতে হত। একদিন আমি গাছতলায় বসে মেয়েদের বোঝাচ্ছি আমার এক আত্মীয় আমাকে দেখে ফেলল। আমি তাঁকে গিয়ে বললাম,

— 'তুমি যে আমাকে দেখেছ এ কথা কখনও তুমি আমার বাড়িতে জানিও না। আমি আজ ঘটনাচক্রে এখানে বসে কাজ করছি। না হলে আমাকে টেবিল-চেয়ারে বসেই কাজ করতে হয়। বাইরে ঘোরাঘুরি করতে হয় না।'

'কিন্তু আমার আত্মীয় আমার সে কথা বিশ্বাস করেনি। আমি দু'বছর বাড়ির থেকে লুকিয়ে রেখেছিলাম আমার কাজটা। কিন্তু এরপর যখন আমি বাড়ি গেলাম দেখি মা গম্ভীর, আমার সঙ্গে কথা বলছেন না। তারপর মা আমাকে বললেন,

— 'তুমি ওই কাজ ছেড়ে দাও।'

আমি বললাম,

— 'মা তুমি নিজে গরিবের জন্য কত কাজ কর। প্রতি শুক্রবার তুমি বেশি করে রাঁধো, যাতে গরিবদের খাওয়ানো যায়। তুমি গরিবের কথা ভাব। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে— নিজের মতো করে। আমি যা করছি গরিবদের জন্যে করছি— একটি প্রতিষ্ঠানের হয়ে। তা হলে তুমি আমাকে কেন অনুমতি দেবে না?'

'এ কথা শুনে মা শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন। তবে মা নিজে কখনও বাড়ির

বাইরে যাননি। এমনকি নিজের সন্তানের বাড়িও নয়। তারাই মায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসত। তারপর আবার আমি কাজে নেমে পড়লাম।'

কিন্তু সে কাজ নূরহাজানের কাছে সহজ ছিল না। উনি ঋণ নেওয়ার জন্য মেয়েদের বলতেন। মহিলারা কল্পনাও করতে পারত না যে তারা টাকা নিয়ে কাজ করে দুটো পয়সা আয় করবে। তারা বলত,

— 'আমরা মেয়ে আমরা কেন টাকা নেব? আমরা টাকা নিয়ে কী করব? ওই আমার স্বামী। আমার স্বামীকে টাকা দেন।' নূরজাহান বলছিলেন, 'টাকা নিয়ে কাজ করতে পারবে এই বিশ্বাস তাদের ছিল না।' তাই শুরুতে তাঁদের অনেক বাধার সামনে পড়তে হয়েছে। প্রথমে ঠিক ছিল পঞ্চাশ শতাংশ টাকা দেওয়া হবে মহিলাদের। বাকি পঞ্চাশ শতাংশ মহিলা-পুরুষ উভয়েই নিতে পারবেন। এই পঞ্চাশ শতাংশ মহিলা জোগাড় করা যে কী কঠিন কাজ ছিল।

'আমাদের প্রেরণা দিতে হয়েছে। শুধু মহিলার সঙ্গে কথা বলে লাভ হয়নি। তাঁদের স্বামীদের বোঝাতে হয়েছে।

— আপনি রিকশা চালান। এখন এক হাতে উপায় হয়। আপনার স্ত্রী যদি কিছু করেন তবে দু'হাতে আয় হবে। কোনওদিন আপনি রিকশা চালাতে না পারলে আয় হয় না। সেদিনটা দুশ্চিন্তার। কিন্তু আপনার স্ত্রীও রোজগার করলে তখন আর খাওয়ার দুশ্চিন্তা থাকবে না। আপনাদের ছেলেমেয়েরা তখন স্কুলে পড়তে পারবে। ভাল পোশাক পরতে পারবে। আর কিছু না হোক উপোসি থাকতে হবে না। আমরা ঋণের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আপনার স্ত্রীকে বলুন ঋণ নিতে।

শুধু ঋণ নিয়ে গ্রামের এক একটি পরিবারকে দারিদ্র্যের হাত থেকে বাঁচানোই নূরজাহানের একমাত্র কাজ ছিল না। তাঁকে গ্রামের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখতে বলেছিলেন স্যার (মুহাম্মদ ইউনূস)। নূরজাহান এম এ পাস মেয়ে। তিনি জানেন পরিবার ছোট রাখলে কী সুবিধে। তিনি একদিন স্যারকে গিয়ে বললেন,

— আমি পরিবার পরিকল্পনা নিয়ে গ্রামে কথা বলতে চাই।

স্যার বললেন, এখন না, সময় হলে বলব। তারপর স্যার একদিন নূরজাহানকে বললেন, 'এবার তুমি বলতে পার।'

নূরজাহান সেই মতো গাছতলায় বসে চার-পাঁচজন মহিলার সঙ্গে পরিবার পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলতে গেলেন। তিনি কথা বলতে বলতে বিষয়টার মধ্যে ঢুকে গিয়েছেন। তাঁর খেয়ালই নেই কখন গ্রামের বাসিন্দারা তাঁকে ঘিরে ধরেছেন। তাঁরা তীব্র চেঁচামেচি শুরু করে দিলেন। নূরজাহানকে বকাবকি করে বললেন, 'তুমি জানো না এ-সব ইসলাম ধর্মে নিষিদ্ধ আছে।'

নূরজাহান তাড়াতাড়ি করে উঠে দাঁড়িয়ে পালিয়ে এলেন। স্যারকে বললেন। স্যার আবার ওই গ্রামেই যেতে বললেন। এবার তিনি দিলেন ছোট্ট টিপ্‌স।

— এভাবে গ্রামের পাঁচজনকে ডেকে তুমি কথা বলবে না। যাদের মধ্যে সম্ভাবনা আছে বুঝবে তাদের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলবে। হাঁকডাক চলবে না। তাদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করাতে হবে। তুমি তাদের বোঝাবে, তারপর সরকারের লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেবে।

'আমি মেয়েদের গিয়ে বলতাম,

— আপনার স্বামী আর দুটো বিয়ে করল, আপনি কিছু বললেন না?

তিনি বলতেন, স্বামীর যদি খাওয়াবার হিম্মত থাকে তা হলে য'টা ইচ্ছে বিয়ে করবে।

আমি বলতাম, আর আপনার ভালবাসা? তা যে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে।

সে শুধু জানে খাওয়া আর পরা। ভালবাসা ভাগ সে বোঝে না। আমি যখন ভালবাসা ভাগ হওয়ার কথা বলি সে নিচু মুখ আরও নামিয়ে বলে,

— কোনও মেয়ে কি তাতে রাজি হয়?

আসলে এরা গরিব। সামাজিক সমস্যা বুঝতে এদের সময় লাগে। প্রথমে এদের খাওয়া-পরার সমস্যা মিটিয়ে এদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করাতে হবে। আমরা বলি, সব গ্রামীণ সদস্যের ছেলেমেয়েরা পড়বে।'

'আর সামাজিক সমস্যা বলতে একটা তো আছে যৌতুকের সমস্যা। আমরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সদস্যদের বলি,

আপনারা নিজের ছেলেমেয়ের সঙ্গে অন্য সদস্যের ছেলেমেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করুন। তা হলে যৌতুকের সমস্যা মিটবে। পণ বড় সমস্যা। কেন পণ দিয়ে বিয়ে দেবেন?

আমরা বর্ষায় গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সদস্যদের বীজ, চারা দিই। যাতে তারা বাড়িতেই শাকসবজি করে খেতে পারে। এখানে অদ্ভুত কথা বলা হয়। অন্তঃসত্ত্বাদের বলা হয়, তোমরা কম খেও, তা হলে শিশু ছোট হবে, ডেলিভারিতে সুবিধে হবে, যন্ত্রণা হবে কম। আমরাই গিয়ে বোঝাই, মা পুষ্টিকর খাবার না খেলে সন্তানের বাড় হবে না। দু'জনেই পুষ্টির অভাবে, রক্তাল্পতায় ভুগবে।'

'আমরা এখন বলি বাড়িতে যতটুকু জায়গা আছে শাকসবজি লাগাও, খাও। অনেক সময়ে গ্রামের মহিলারা বলে, এটা খাওয়া খারাপ, ওটা খাওয়া খারাপ। আমরা শুধু টাকা দিয়ে ক্ষান্ত হই না, সমাজকে সচেতন করা, গ্রামের দরিদ্র মানুষকে সচেতন করা, তাদের কী করা উচিত, কী করা উচিত নয় বলাও আমাদের কাজ। তারা যাতে পুষ্টি পায়, সেটার দিকেও আমরা নজর রাখি। সে জন্যেই স্যার নোবেলের টাকায় পুষ্টি প্রকল্পের কাজ করছেন। গরিব ঘরের ছেলেমেয়েদের জন্যে পুষ্টিসম্পন্ন দই উৎপাদন করতে চান তিনি। নোবেলের টাকার একটা অংশ তিনি গ্রামীণ ব্যাঙ্ককে দেবেন। তা দিয়ে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের যে সদস্য সব থেকে কৃতিত্ব দেখাতে পারবেন তাঁকে পুরস্কার দেওয়া হবে। তাঁর কাছে

কৃতিত্ব মানে নিছক ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবস্থা আর শোধ করা নয়। তিনি সব সময়েই সমাজ সচেতনতার কথা ভাবেন, আমাদেরও শেখান যাতে আমরা গ্রামে গিয়ে তা বলতে পারি। নোবেলের টাকার একটা অংশ দিয়ে তিনি চক্ষু হাসপাতাল গড়বেন, যেখানে দশ-কুড়ি টাকা খরচ করে একজন ভিক্ষুকও চিকিৎসাসেবা পাবেন।'

যে সামাজিক সচেতনতার কথা নূরজাহান বলছিলেন তা তিনি গ্রামে গ্রামে গিয়ে প্রচার করেছেন। তিনি গ্রামে গিয়ে দেখেছেন, 'মেয়েদের যে সম্পত্তির অধিকার আছে তা তারা জানেই না। আসলে এই অধিকার রয়েছে খাতায়-কলমে, বাস্তবে কেউ পায় না। বাংলাদেশের গ্রামের যে-কোনও মহিলার বিয়ে কচুপাতায় জলের মতো টলমল টলমল করে। আজ স্বামী তাকে তালাক দিল আর সে সঙ্গে সঙ্গে 'নেই' হয়ে গেল। কোথায় আশ্রয় নেবে? বাপের বাড়ি ছাড়া কোনও জায়গা আছে? মেয়েরা বাপের বাড়ির সম্পত্তি পায়ও না, নেয়ও না। সে তো জানে তার ওরকম কোনও অধিকার নেই। তিন তালাক বললে যে তালাক হয় না, তা-ও সে জানে না। আমরা গ্রামে গিয়ে এ-সব প্রচার করি।'

'আমরা তাই গৃহঋণ দিই মহিলাকে। জমি তার নামে। তাই ঘরও তার নামে। ঘরের মালিক সে। স্বামী এখন ইচ্ছে করলেই তালাক দিতে পারে না। বাংলাদেশের গ্রামে বিবাহবিচ্ছেদ বা তালাক কমে গেছে। এখন প্রশ্ন জড়িয়ে গেছে। স্বামী তালাক দিলে কোথায় গিয়ে আশ্রয় নেবে? ঘর তো স্ত্রীর নামে। আগের থেকে গ্রামে গৃহ অশান্তি কমেছে। ঘরে শান্তি এসেছে, ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে।'

'ঘর থাকলেই তো হল না, চাই উপযুক্ত স্যানিটেশনের ব্যবস্থা। যেখানে সে ব্যবস্থা নেই সে গ্রামে গিয়ে বলি, একটা গর্ত করে সেখানে টয়লেটের ব্যবস্থা কর। বালি চাপা দাও। তা হলে যত্রতত্র মলমূত্র পড়ে থাকবে না। আমার একটা দিন গিয়েছে যখন গ্রামে মানুষের মল পেরিয়ে পেরিয়ে হাঁটতে হয়েছে। আমরা এখন বলি, এটা চলবে না। এতে গ্রামে সব সময়ে ডায়রিয়া লেগে থাকে। তার জন্যে আমরা ওরাল রিহাইড্রেশন বানাতে বলি। জল ফুটিয়ে, এক চিমটে নুন আর চিনি দিয়ে খাওয়াতে বলি। শুধু টাকা দিয়ে আমাদের কাজ শেষ হয়ে যায় না। আমরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে কোথাও দু'দিন, কোথাও তিনদিন, কোথাও বা সাতদিনের ওয়ার্কশপ করি।'

'গ্রামীণ ব্যাঙ্ক কী উদ্দেশ্যে ঋণ দেয় তা যদি জানেন তা হলে বুঝবেন আমরা ভেতরে ভেতরে পাল্টে দিতে চাই সমাজটাকে। দারিদ্র্য দূর করা আমাদের প্রধান কাজ, আর একটা কাজ সমাজের যে জগদ্দল দেওয়ালটা সব ভালকে আটকে রাখছে, সব এগিয়ে যাওয়াকে আটকে দিচ্ছে, সেই দেওয়ালটাকে ভেঙে দেওয়া। সেই দেওয়াল ভাঙার দেবদূত আমাদের স্যার। আমরা সহযোদ্ধা।

আমি নূরজাহানের কাছ থেকে জেনে নিলাম কোন ষোলটি কারণে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ঋণ দেয় এবং পরিবেশের উন্নতিতে সদস্যদের আর কী করতে বলা হয়:

১) শৃঙ্খলা, একতা, সাহস, পরিশ্রম— গ্রামীণ ব্যাঙ্কের এই চার নীতি কেন্দ্রের সদস্যের মাধ্যমে জীবনের প্রতিটি কাজে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলব।
২) আমরা সংসারের উন্নতি আনবই আনব।
৩) ভাঙা ঘরে থাকব না। ভাঙা ঘর মেরামত করব। যত তাড়াতাড়ি পারি ভাল দেখে নতুন ঘর বানাব।
৪) সারা বছর আমরা শাকসবজি খাব। বিক্রি করে আয় বাড়াব।
৫) চারা গাছের মরশুমে যত পারি চারা লাগাব।
৬) পরিবার ছোট রাখব। খরচ কমাব। স্বাস্থ্য ভাল রাখব।
৭) সকল সদস্যের ছেলেমেয়ের পড়াশোনার ব্যবস্থা করব।
৮) ছেলেমেয়ে, বাড়িঘর সব সময়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখব।
৯) গর্ত করে টয়লেট বানাব।
১০) টিউবওয়েলের জল খাব। টিউবওয়েল না থাকলে জল ফুটিয়ে খাব।
১১) ছেলেমেয়ের বিয়েতে যৌতুক দেব না। যৌতুক নেব না। কেন্দ্রকে যৌতুকের রোগ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করব। কম বয়সে ছেলেমেয়ের বিয়ে দেব না।
১২) নিজে অন্যায় করব না, অন্যকেও অন্যায় করতে দেব না।
১৩) বেশি আয়ের জন্য সবাই মিলে যৌথ উদ্যোগে বড় কাজে হাত দেব।
১৪) একে অন্যকে সাহায্য করব। কেন্দ্রের কেউ কোনও বিপদে পড়লে সবাই মিলে তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করব।
১৫) কোনও কেন্দ্রে কোনওরকম বিশৃঙ্খলার খবর পাওয়া গেলে সবাই মিলে গিয়ে সেখানে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনব।
১৬) কেন্দ্রে কেন্দ্রে ব্যায়াম চালু করব। সকল সামাজিক কাজ একসঙ্গে করব। বাংলাদেশের ক'টা গ্রামে গিয়ে দেখেছি প্রত্যেকের ঘর তকতক করছে। যেটুকু জমি আছে তাতে শাকসবজি লাগানো হয়েছে। বুঝি এ-সব গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সহজ পাঠ।

নূরজাহান যখনই কাজ করতে গ্রামে যেতেন গ্রামের মানুষকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শিক্ষা দেওয়া ছিল তাঁর কাজের অন্যতম অঙ্গ। সেই সত্তরের দশকের মাঝামাঝি হতে তিনি মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে কাজ করছেন। তাঁর নির্দেশে গ্রামে গেছেন, কত পথ হেঁটেছেন। ইউনূসের একটা বড় গুণ তাঁর সঙ্গে যাঁরা কাজ করেন তাঁরা তাঁকে ছেড়ে যান না। সেই শুরু থেকে দীপাল, দায়ান, নূরজাহানদের যে ব্যবস্থাপনা টিম তিনি গড়ে তুলেছেন আজও সেই টিম গ্রামীণ ব্যাঙ্কের হাল ধরে রেখেছেন। পরে যুক্ত হয়েছেন আরও অনেকে, কিন্তু পুরনোরা ছেড়ে যাননি। তখন গ্রামীণ ব্যাঙ্কের নিজস্ব বাড়ি ছিল না। শ্যামলীর ভাড়া বাড়িতেই ছিল তার প্রধান অফিস। অবশ্য

প্রধান অফিসের চেয়ে জোনাল অফিস, আঞ্চলিক অফিসই ছিল গ্রামীণ ব্যাঙ্কের মূল প্রাণকেন্দ্র। কেন্দ্রের মধ্যে কেন্দ্র মডেলে চলে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক। যার স্বায়ত্তশাসন রয়েছে একেকটি পর্যায়ের গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ব্যবস্থাপনার। শাখাকে দেখতে হয় কেন্দ্রকে। আর শাখার দেখভাল করে এরিয়া অফিস। এরিয়া অফিসকে দেখে জোনাল অফিস। প্রধান অফিসের কাজ হচ্ছে নীতি নির্ধারণ ও সমন্বয় করা। মূল্যায়নও করে সদর দপ্তর। ঋণ দিয়েই হাত গুটিয়ে বসে থাকে না গ্রামীণ ব্যাঙ্ক। সেই ঋণ যাতে উপযুক্ত কাজে ব্যবহার করা হয় সেদিকে খেয়াল রাখে। আর সর্বক্ষণ ঋণ আদায়ের তদারকি করে। ঢাকায় মিরপুরে বসে ম্যানেজিং ডিরেক্টর মুহাম্মদ ইউনূস এই কাজটা করেন। তাঁর সঙ্গে দীপালচন্দ্র বড়ুয়া, নূরজাহান বেগমের মতো সহযোদ্ধারা আছেন। বহু পথ পেরিয়ে, বাধা টপকে আজ নূরজাহান একজন আত্মবিশ্বাসী, দক্ষ জেনারেল ম্যানেজার, যিনি নিজে কাজ করেন আর করিয়ে নিতেও জানেন। মধুর হাসিতে, মধুর ভাষায়।

নোবেল গরবিনী ফিরোজাও

বামন গাজিপুর। ঢাকা ছেড়ে যেতে হয়। প্রথমে গিয়েছিলাম ঢাকার মিরপুরে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সদর দপ্তরে। সামনে একটা বড় বাড়ি। সেটা ছাড়িয়ে চব্বিশ তলা বাড়ি। বিশাল বাড়িটা ছুঁচ্ছে যেন আকাশ। অধ্যাপক ইউনূসের মতো প্রকাণ্ড, গগনচুম্বী। যে মানুষটা নোবেল পেয়েছেন তাঁর কাজ দেখতে যেতে হবে বলেই বামন গাজিপুর যাওয়া। কী করে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক প্রথমে তার ডালপালা ছড়াল, তার পর পাখনা মেলল— এ সব শুনতে শুনতে গেলাম বামন গাজিপুর। বলছিলেন গ্রামীণ ব্যাঙ্কের প্রিন্সিপাল অফিসার এস ডি মুসলেউদ্দিন। তা হলে এবার ছাড়ো ঢাকা। মিরপুর থেকে এয়ারপোর্ট রোড, ময়মনসিং রোড ধরে ছুটছে আমাদের বড় গাড়িটা। ঢাকার মসৃণ রাস্তার সঙ্গে মানানসই। টঙ্গির পরই বামন গাজিপুর। দক্ষিণ সালনা গ্রাম। ইটের রাস্তা। লালচে। বড় গাড়িটা দুলতে দুলতে ঢুকে গেল। নেমে মাটির রাস্তা। ওখান থেকে হাঁটাপথ। ফিরোজা বেগমের ঘর। বড় নয়। পরিচ্ছন্ন। পরিষ্কার চাদর পাতা। তক্তপোশে। সবুজ ফ্যান মাথার ওপর ঘুরছে। ডিমের ক্রেট মাটিতে। একটার ওপর একটা চাপানো। একটু পরে ফিরোজা বেগম এলেন। পান-খাওয়া লাল ছোপ দাঁতে। ছাপা শাড়ি। কোথাও অপরিচ্ছন্নতার চিহ্ন নেই। ঘর বড় আলোময়। দুপুরের চড়া রোদ এসে ঢুকেছে। তিনি গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সদস্য। শুনেছেন অধ্যাপক ইউনূসের নাম। আঁচলটা মুখে চাপা দিয়ে এক গাল হেসে বললেন— জানি, জানি পুরস্কার পেয়েছেন। বড় প্রফেসর। বড় মানুষ। মুসলেউদ্দিন বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন, সুইডেনের নোবেল পুরস্কার। উনি থামলেন না। গর্বিত ঢঙে বলে উঠলেন, 'আমাদের ব্যাঙ্কও পেয়েছে।' এবার মুসলেউদ্দিন অভিভূত। 'হ্যাঁ আপনারা ঋণ নিয়ে ফেরত দেন বলেই এটা সম্ভব হল।' মাটির রাস্তার ওপর যাঁদের বাড়ি, যাঁদের মাথার ওপর টিনের ছাদ, তাঁরা,

এই গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সদস্যরা কোনওদিন ঋণ ফেলে রাখেন না। সব শোধ দিয়ে দেন। সময়ে। একেবারে কড়ায় গন্ডায়। মনে পড়ল এ দেশের তাবড় শিল্পপতি, ক্ষমতাবানদের কথা। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরে থাকেন, লিমুজিন চড়েন, দামি পোশাক পরেন, বিলাসবহুল আহার-পানীয়ে অভ্যস্ত। তাঁদের অনেকেই ঋণ-খেলাপি। ক্ষমতা নামক সুতো টেনে তাঁরা ঋণশোধের বিষয়টি তুলে রাখতে পারেন শিকেয়।

ফিরোজাকে জিজ্ঞেস করি, যখন গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সদস্য ছিলেন না তখন কী করতেন? কোনও রাখঢাক না করে বললেন, 'ছোট বয়সে বিয়ে হয়েছিল। কুড়ি বছর বয়সে স্বামী ছেড়ে দিয়ে আর একটা বিয়ে করলেন। তখন কোলে তিন মাসের ছেলে। আর তিন বছরের মেয়ে। লোকের বাড়ি কাজ শুরু করলাম। ছেলেমেয়েকে কোথায় রেখে যাব? যাদের বাড়িতে কাজ করতাম তাদের বাড়ির মেঝেয় কাঁথায় শুইয়ে দিতাম ছেলেকে। মেয়েকে একটা প্লাস্টিকের খেলনা ছিল, সেটা দিতাম। তা বছর কুড়ি আগের কথা। বাড়ির মালিকরা মেয়েটাকে মারত। ছেলেকে নিয়ে যেতাম বলে রাগ করত। দুর্ব্যবহার করত। খেতে পেতাম না তেমন। সারা দিনরাত কাজ করতাম। তাতেও কুলোত না বলে বাড়ি এসে রাত জেগে ধান সিদ্ধ করতাম। ধানগোলার কাজ। রাত সাড়ে বারোটা-পৌনে একটায় রেঁধে খেতাম। খাওয়াতাম। কোনও কোনওদিন ঘরে কিছু না থাকলে আটা গোলা খেতাম।' এই পর্যন্ত বলে ফিরোজা একটু থামলেন। চোখের কোণটা চিকচিক করছিল। এক ফোঁটা মুক্তোবিন্দুর মতো। বুঝলাম, শ্রেণী বৈষম্যের সেটাই সেই কুড়ি বছরের নারীর প্রাথমিক বোধ। যে বাড়িতে সে কাজ করত সেখানে পৃথিবীর ধুলোমাখা পায়ে ঢুকে পড়েছিল আদুল গায়ের একটি তিন বছরের মেয়ে আর একটি অবোধ শিশু হাত-পা নাড়তে। তাদের বাড়িটিকে হয়ত নিখুঁত করে রাখার জন্য তাদের মা-কে নিয়োগ করা হয়েছিল, আর সেই নিখুঁত বাড়িটিতে যাতে কোনও খুঁত প্রবেশ করতে না পারে তাই দুই শিশুর সেখানে প্রবেশের অনুমতি ছিল না।

সেই কঠিন সময়ে ফিরোজার বড় ভাই খবর দিলেন, 'গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সদস্য হয়ে যা। টাকা পাবি। নিজের মতো করে কিছু করতে পারবি।' কিন্তু তখন তাদের দক্ষিণ সালনা গ্রামে অজানাকে ভয়। গ্রামীণ ব্যাঙ্ক? 'তারা তোদের কাছ থেকে জিনিস নিয়ে আর ফেরত দেবে না।' অধ্যাপক ইউনূসকে প্রথম দিকে সেই গ্রামীণ অজ্ঞজনের ভয় তাড়াতে হয়েছে। প্রচার করতে হয়েছে, গ্রামীণ ব্যাঙ্ক নেবে না কিছুই, টাকা দেবে। তাই দিয়ে কাজ করতে হবে। কাজ করে ঋণ শোধ দিতে হবে। ফিরোজা বেগম দক্ষিণ সালনা গ্রামের পড়াশোনা না জানা এক নারী। অজ্ঞতার ভয়কে জয় করলেন। পড়শি মাজেদা বেগমের সঙ্গে আলোচনা করলেন। তিনিও ফিরোজার মতো দুর্বিপাকে। দুই সই সাহসে ভর করে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সদস্য

হলেন। তখন তাঁর ঘরে খড়ের ছাউনি। তা-ও খড় ছাওয়া হয় না সময় মতো। একবেলা আধপেটা খাওয়া জোটে কি জোটে না। পরনে অন্তত আধডজন তাপ্পি দেওয়া ছেঁড়া শাড়ি। তাতে রোজই ছেঁড়া সেলাইয়ের স্পর্শ পড়ে। ফিরোজা আর মাজেদাকে হয়ত তখন ছেঁড়া সেলাইয়ের জন্য ছিন্নশ্রী উপাধি দেওয়া যেত।

প্রথম দফায় ফিরোজা দু'হাজার টাকা ঋণ পেলেন। নিজে ধান কিনে মুড়ি ভেজে এক বছরে সে টাকা শোধ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আবার ঋণ। এবার পাঁচ হাজার টাকা। শোধ সেই এক বছরেই। তার পরের বার আট হাজার টাকা। ঋণ শোধ শেষ হলেই, নতুন ঋণ। শর্ত একটাই। এক বছরে শোধ দিতে হবে। তা হলে আবার বেশি টাকা ঋণ পাওয়া যাবে। তার পর ঋণ বেড়ে দাঁড়াল দশ হাজার টাকা। তখন তিনি মুড়ি ভাজার সঙ্গে সঙ্গে নতুন ব্যবসা শুরু করলেন। পোলট্রি ব্যবসা। পঞ্চাশটা মুরগি দিয়ে শুরু। এখন তাঁর ঋণের পরিমাণ দু' লক্ষ টাকা। ঘরের পাশে মুরগির খাঁচা। এক হাজার মোরগ-মুরগি, লাল ঝুঁটি কঁক কঁক করছে। আর তাঁর সেই তিন মাসের ছেলেটির হাতে এখন গ্রামীণ ফোন। মোবাইল সেট। লাল মোরগঝুঁটি রঙের। সঙ্গে মাছের খামার ভাড়া করেছেন ফিরোজা। সেই তিন বছরের মেয়েটি আজ বিবাহিত। নাতি-নাতনির গায়ের রঙ ফর্সা টুকটুকে। তারা মাঝে মাঝেই আসে। ছেলে আর ফিরোজা এখন ব্যবসা দেখেন। আর মাদুরের পাটিও বানান ফিরোজা। সে-সব ঢাকায় চলে যায়। চড়া দামে বিক্রি হয়। নিজে বাড়ি কিনেছেন। গ্রামের বাড়িতে চার কাঠা জমি। এখন দাম কাঠা প্রতি লাখ টাকা। বাগানে শিম, লালকুমড়ো, চালকুমড়ো, লাউ, টমেটো হয়। বছরের আনাজপাতি তাঁকে কিনে খেতে হয় না।

কুড়ি বছর আগের এক বিকেলে ফিরোজা শুনেছিলেন স্বামী আর আসবে না। বিয়ে করেছে। ফিরোজা তাঁর মতো করে সে-বিকেলের বর্ণনা দিয়েছিলেন। আমি আমার মতো করে তা দেখলাম। তখন ম্লান আলো চরাচর জুড়ে। খড়ের ছাউনিতে তা আরও বিবর্ণ। ফিরোজার পুরনো জগৎ হারিয়ে যাওয়া। চেনা লোকটির চলে যাওয়া। তাঁর পরিচিত জগৎ আরও দূরে, আরও কঠিন। এইভাবেই ফিরোজা বিদায় জানিয়েছিলেন তাঁর পুরনো জগৎ, পুরনো স্বামীকে। কিন্তু কী এক অবোধ সাহসে ভর দিয়ে ফেলেছিলেন বাংলার এক কুড়ি বছরের নারী। তাই বোধহয় আজ তাঁর স্বামী তাঁর কাছে ফিরতে চায়। কারণ, ফিরোজা আজ স্বাবলম্বী। টিনের বাড়ি-সহ চার কাঠা জমি, পোলট্রি, বাগানের মালকিন। স্বামীকে আর চান না। ফিরোজা যখন এ কথা বলছিলেন, কী এক গভীরতা, দৃঢ়তা, প্রত্যয় তাঁর কণ্ঠে।

বাংলাদেশের গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, অধ্যাপক ইউনূস যার জনক, সেই ব্যাঙ্ক এমনি করেই আজ তিরিশ বছর ধরে কখনও নিরুচ্চারে, কখনও সরবে বাংলার নারীদের অর্থবল জুগিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে পিঠোপিঠি লেগে আছে মনোবল। তাঁর

বিশ্বাস, নারীশক্তির হাতে অর্থবল মানেই দেশের এগিয়ে যাওয়া। গ্রামীণ ব্যাঙ্ক যায় গরিবের দুয়ারে। সেখানেই তাঁদের আবেদন-পদ্ধতি বলে দেয়। ঋণ ফেরত দেওয়ার দিন আবার গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ষোল হাজার কর্মীর স্থানীয়রা যান তাঁদের কাছে। গরিব মানুষগুলো ঠিক শোধ দিয়ে দেন ঋণ। ঠিক সময়ে। শুধু ঋণ নেওয়ার দিনটা তাঁদের সংশ্লিষ্ট ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে হয়। আর সব সময়ই গ্রামীণ ব্যাঙ্কের কর্মীরা তাঁদের পাশে থাকেন হাসিমুখে। মুসলেউদ্দিন বললেন, বামন গাজিপুরে আমাদের ঋণশোধের হার একশো শতাংশ। সারা বাংলাদেশে আটষট্টি হাজার গ্রাম আছে। এমন কোনও গ্রাম নেই যেখানে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের পদচারণা নেই। একদিন দেখা যাবে বাংলাদেশের সব গ্রামীণ পরিবারের একজন করে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সদস্য। অধ্যাপক ইউনূসের সেটাই স্বপ্ন। দারিদ্র্যের হাতে পৃথিবীকে ছেড়ে দেব না। মেয়েদের তো নয়ই। তাঁর ব্যাঙ্কের সদস্যদের ছিয়ানব্বই শতাংশ মহিলা। আর চার শতাংশ পুরুষ। এখনও সব গ্রামীণ পরিবারে পৌঁছনো যায়নি। গ্রামের মেয়েদের জন্য সংগ্রাম এখনও বাকি রয়ে গেছে। কে করবে? আছেন অধ্যাপক ইউনূস। আছে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক। কীটপতঙ্গের হাতে পৃথিবীকে ছেড়ে দেবেন না তিনি। এখনও আরও কাজ বাকি। পৌঁছতে হবে আরও গ্রামের দরজায়। পৌঁছনো যাবে। যাবেই।

সাফল্যের জাদুদণ্ড

ঢাকায় মুহাম্মদ ইউনূসকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তাঁর সাফল্যের জাদু মন্ত্রণাটা কী? তিনি বলেছিলেন, তাঁর কাছে কোনও জাদুদণ্ড নেই— আছে পরিশ্রম, সততা, নিষ্ঠা। তাঁর কাছ থেকে জেনে নিয়েছি সাফল্যের চাবিকাঠি। তিনি কয়েকটা কারণের কথা বলেছেন। তারপরই বলেছেন কারণগুলো গুরুত্ব অনুযায়ী সাজানো নয়। তিনি সাফল্যের কারণ যেগুলো মনে করেন সেগুলো বলে যাচ্ছেন।

যেমন তিনি মনে করেন ব্যাঙ্কার আর ঋণগ্রহীতার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সাফল্যের পেছনে এক বড় কারণ। তা ছাড়া ঋণগ্রহীতাদের মধ্যেও রয়েছে সুসম্পর্ক যা তাদের সুখে দুঃখে বেঁধে রেখেছে।

ছোট ছোট পাঁচ সদস্যের দল তৈরি করা হয়েছে যাঁরা একে অপরকে চেনেন। তাঁরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের পাশে রয়েছেন। আবার কেউ ইচ্ছে করে ঋণ-খেলাপি হলে তাঁরাই জোটবদ্ধ হয়ে যে ঋণ খেলাপ করছে তার ওপর চাপ তৈরি করেন। গ্রামীণ ব্যাঙ্কের কোনও নিয়ম ভাঙলেও এরকম চাপ তৈরি করা হয়। আবার একইভাবে যদি কেউ টাকাপয়সা নিয়ে কোনও প্রকৃত দুরবস্থার মধ্যে পড়েন তখন তাঁর দলের সদস্যরাই তাঁকে আগলে রাখেন।

যদি কোনও দলে গরিবের সঙ্গে তত গরিব নন-দের মিশিয়ে দেওয়া হত তা হলে এই প্রকল্প নিশ্চিতভাবেই পাসের মুখ দেখত না। গ্রামীণ ব্যাঙ্ক কাউকে সদস্য করার সময়ে ভাল করে দেখে নেয় তিনি সত্যিই কতটা গরিব। অনেকগুলো ধাপ পেরিয়ে তবে তিনি গরিব হিসেবে ছাড়পত্র পেয়ে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সদস্য হন। যে যত গরিব গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সদস্য হওয়া তাঁর কাছে তত সহজ।

গ্রামীণ ব্যাঙ্ক দরিদ্রতম ব্যক্তিটির কাছে যাওয়ার জন্যে কাজ শুরু করে মহিলাদের মধ্যে। বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে একটা মহিলাদের দল গঠন করা দুরূহ কাজ। ধর্মীয় নেতারা বিরোধিতা করেন। সেই সঙ্গে গ্রামীণ ব্যাঙ্ককে ঘিরে নানা গুজব ছড়ানো হত। যাঁরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিতে যেতেন তাঁদের ওপর নাকি অত্যাচার হবে, তাঁদের খ্রিস্টান করে দেওয়া হবে, জ্বালিয়ে দেওয়া হবে তাঁদের ঘর। এ-সব গুজব পার হয়ে যে সব মহিলা অত্যন্ত অসহায় তাঁরাই প্রথম দিকে দলবদ্ধ হয়েছিলেন। এঁরাই তারপরের দিকের গোষ্ঠীগুলিকে রাস্তা দেখিয়েছেন— পারিবারিক অর্থনীতির উন্নয়নের রাস্তা। যাঁদের অবস্থা তাঁদের থেকে একটু ভাল তাঁরা এই সব-হারানোদের সঙ্গে একদলে পড়তে চাননি।

যেহেতু গ্রামীণ ব্যাঙ্ক গ্রামের ভেতরে ঢুকে যেত সেইজন্য তাদের কাছ থেকে পারিবারিক অর্থনৈতিক অবস্থার চিত্রটা লুকিয়ে রাখা অসম্ভব।

এক একটা পাঁচজনের দল করতে যে সব পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে যেতে হয় সেটাই গ্রামীণ ব্যাঙ্কের শক্তি। পাঁচজন একসঙ্গে কথা বলে নেন, পরস্পর পরস্পরকে চিনে নেন, তারপর বলেন যে তাঁরা দলগঠন করতে ইচ্ছুক। সদস্য হওয়ার আগে বা দল গঠনের আগে এ ওকে ঝাড়াই-বাছাই করে নেন। নিজেরা নিজেদের ঝাড়াই-বাছাইয়ের পর শেষ পর্যন্ত পাঁচজন মিলে দল গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। ঝাড়াই- বাছাইয়ের সময়ে অনেকেই আত্মীয় বা প্রতিবেশীর পরামর্শে নিজেকে সরিয়ে নিতেন। তাঁদের বক্তব্য থাকে একইরকম, গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ঋণের ফাঁদে পড়লে ভালর থেকে খারাপই হবে বেশি। দল গঠনের পর ব্যাঙ্কের সঙ্গে আলোচনা চলে। ততদিনে একটা গোষ্ঠী হিসেবে তাঁরা একে অপরকে জেনে নিয়েছেন, ভরসা করতে শিখেছেন, শুরু হয়ে গেছে নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া। ব্যাঙ্কও গোষ্ঠী বা দল হিসেবে তাদের স্বীকৃতি দেওয়ার আগে ব্যাঙ্কের নিয়মকানুন, শৃঙ্খলা, উচিত-অনুচিত সবই জানিয়ে দেয়। তাই ব্যাঙ্কের সদস্য হওয়ার আগে তারা গ্রামীণ ব্যাঙ্ককে ভাল করে জানার, বোঝার সুযোগ পায়। ব্যাঙ্কের কর্মীদেরও জানা হয়ে যায়, চেনা হয়ে যায় কাছ থেকে। গ্রামীণ ব্যাঙ্কের গোষ্ঠী হওয়ার স্বীকৃতি পাওয়ার আগে বা দল গঠনের আগে সে এক লম্বা পদ্ধতি। একে অন্যকে চেনার, জানার পদ্ধতি। তারপর যখন ব্যাঙ্ক দল হিসেবে স্বীকৃতি দেয় তা তাদের আনন্দ দেয়। মনে এক অনুভূতি জাগায় যাকে ছোট্ট দু'কথায় বলে 'আমি পারি'। এই 'আমি পারি'র আত্মবিশ্বাস জোগায় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক। কাদের? যাঁরা হতদরিদ্র, সহায় নেই, সম্বল নেই, কেউ দেখার নেই, পাশে দাঁড়ানোর নেই কেউ।

যখন কোনও নতুন জায়গায় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক কাজ শুরু করে তখন ব্যাঙ্ক কোনও তাড়াহুড়ো করে না। ধীরস্থিরভাবে এগোয়। গ্রামীণ ব্যাঙ্কের যুক্তিটা এরকম: নিয়মনীতি, পদ্ধতি তার মতো করে সময় নিয়ে এগোবে। গ্রামীণ ব্যাঙ্কের নতুন সদস্য যদি এতদিন গ্রামীণ ব্যাঙ্ককে ছাড়া বেঁচে থাকতে পারেন তবে আর ক'টা

দিনও তিনি অপেক্ষাও করতে পারবেন।

গ্রামীণ ব্যাঙ্কের শাখা সহজ সরল, মসৃণভাবে এগোয়। যখন গ্রামীণ ব্যাঙ্ক কোনও গ্রামে শাখা খুলতে যায় তখন ব্যাঙ্কের একজন ম্যানেজার অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজারকে নিয়ে আসেন। নতুন শাখা খোলার ব্যাপারে অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজারই প্রধান। তাঁরা গ্রামে আসেন বটে, তবে তাঁদের নেই কোনও অফিস, কোনও থাকার জায়গা, কার সঙ্গে কথা বলতে হবে তা-ও তাঁরা জানেন না। তাঁরা যেখানে শাখা খুলতে চান সেই জায়গাটাকে ভাল করে চিনে নেন, বুঝে নেন। ওই জায়গা সম্পর্কে যা খুঁটিনাটি তথ্য সবই তিনি জোগাড় করেন।

তারপর ম্যানেজার ঠিক করেন ওইখানে শাখা খোলা হবে, না কি, পরিকল্পনা বাতিল করে দেওয়া হবে। তিনি কোথায় অফিস হবে তা-ও ভেবে নেন। তাঁর হাতে থাকে এলাকার মানচিত্র। যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, তিনি জেনে নেন তার ইতিহাস-সংস্কৃতি-অর্থনীতি এবং দারিদ্র্যের বর্ণনা বা গরিবি অবস্থা।

যখন তিনি ঠিক করেন যে সেখানে শাখা খোলা হবে তখন তিনি সেখানকার মানুষজনের কাছে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের নিয়মকানুন, উদ্দেশ্য সব কিছু ব্যাখ্যা করেন। এজন্যে তিনি একটি মিটিং ডাকেন। সেই মিটিংয়ে তিনি গ্রামের সব লোককে মাইক বাজিয়ে প্রচার করে জড়ো করার চেষ্টা করেন। তার মধ্যে বিশেষত গ্রামের প্রধান, ধর্মীয় নেতা, শিক্ষক, সরকারি অফিসার যাঁরাই থাকেন তাঁদের ডাকা হয়। গ্রামীণ ব্যাঙ্কের উঁচুপদের অফিসারেরা সেই মিটিংয়ে তাঁদের বক্তব্য বলেন। তারপর গ্রামীণ ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে বলা হয়, যে গ্রামবাসীরাই বলুন ব্যাঙ্কের সব নিয়মকানুন মেনে তাঁরা ব্যাঙ্ককে স্বাগত জানাতে তৈরি কী না। না হলে, একটা সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গ্রামবাসীরা যেন গ্রামীণ ব্যাঙ্কের কর্মকর্তাদের গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে বলতে পারেন।

মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, এ পর্যন্ত কোনও গ্রাম থেকে তাঁরা বিতাড়িত হননি। আর নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পরও তাঁদের পদ্ধতি একই থাকবে। তবে তিনি ভাল করেই জানেন এরপর থেকে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের কর্মকর্তারা যে-সব পরিবারে এখনও তাঁদের ঢোকা বাকি আছে সে-সব জায়গায় তাঁরা আরও উষ্ণ সংবর্ধনা পাবেন। তাঁদের স্বাগত জানানোর জন্য তৈরি থাকবে সব পরিবার। এতদিন কোথাও কোনও দলকে স্বীকৃতি দিতে গেলে যত সময় অবলম্বন করতে হত এবার থেকে তা আর হবে না। কাজের গতিতে জুড়ে যাবে ডানা। দুমদাম হয়ে যাবে সব কাজ। তবে এতদিন তাঁরা এভাবে ধীরে পথ চলেছেন বলেই বিরোধিতা কাটিয়ে এগিয়েছেন, সাফল্যের মুখ দেখেছেন। হুড়োহুড়ি না করাটা সাফল্যের অন্যতম কারণ বলে অধ্যাপক ইউনূস মনে করেন।

কোনও পরিবারকে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সদস্য করার জন্য ম্যানেজার আর তাঁর অ্যাসোসিয়েট, মানুষের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য সতত তৈরি থাকেন। এর

জন্য তাঁরা মাইলের পর মাইল গ্রামের পথে হাঁটেন। প্রস্তাবিত শাখা যেখানে খোলা হয় তার থেকে সব থেকে দূরের গ্রামটির থেকে আগে সদস্য করা হয়। আর তাঁদের মহিলা হতে হবে তো বটেই। যেই গ্রামীণ ব্যাঙ্কের কর্মকর্তারা মহিলাদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেন অমনি ধর্মীয় নেতারা উসখুস করে উঠতেন। গোলমাল লাগতে শুরু করে। উত্তেজনার পারদ চড়তে থাকত। এতকাল গ্রামীণ ব্যাঙ্ক আর তার মহিলা সদস্যদের সম্পর্কে ভয়ঙ্কর ও নিরন্তর গুজব ছড়াত। কিন্তু অসহায় মহিলারা ঋণ পাবেন শুনে সে-সব গুজবে বা হুমকিতে কান দিতেন না। কারণ, তাঁদের হয় স্বামী তালাক দিয়েছে, নয় ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে। পিছনে ফেলে রেখে গেছে অনাহারক্লিষ্ট কয়েকটি সন্তান। তাঁরা খুইয়েছেন সব কিছু, আর হারানোর কিছু নেই। তাই সব প্রতিকূলতাকে জয় করার একটা শেষ সুযোগ এসেছে তাঁদের কাছে। কোথাও ফিরে তাকানোর নেই। নেই কোনও আশ্রয়। তখন ধর্মীয় নেতারা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের কর্মকর্তাদের হুমকি দিতেন। 'গ্রামে ঢুকবেন না। যদি ঢোকেন নিজে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে ঢুকবেন।' এমনকি তাঁর ওপর হামলা হতে পারে এমনটাও বলতেন ধর্মীয় নেতারা। তখন ম্যানেজার বুঝে গেছেন কারা হতদরিদ্র, সহায়সম্বলহীন। এরাই তাঁর সম্ভাব্য সদস্য। তিনি সেই মহিলাদের বলতেন, এ গ্রামে আর তাঁর পক্ষে আসা সম্ভব নয়। তাঁরা যদি এর পরের মিটিংয়ে বসতে চান তবে তাঁরা যেন পাশের গ্রামে চলে আসেন। সেই মহিলাদের মুখে চোখে প্রত্যয়। এ সুযোগ ছাড়া চলবে না। তাঁরা যাবেন পাশের গ্রামে।

তাঁরা যখন একবার ঋণ পেলেন তখন তাঁদের দেখাদেখি অন্য মহিলারাও দলবদ্ধ হয়ে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সদস্য হতে আসতেন। তাঁরা তখন ম্যানেজারকে বলতেন, ম্যানেজার যেন তাঁদের গ্রামে আসেন। ম্যানেজার এবার বললেন, তাঁর তো গ্রামে ঢোকা বারণ। যাঁরা বারণ করেছেন এবার তাঁদেরই গ্রামে ফেরার জন্যে বলতে হবে। শেষ পর্যন্ত ম্যানেজারেরই জিত হত। যাঁরা গ্রামে ঢোকা নিষেধ করেছিলেন তাঁরা সে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতেন।

এ-সবই করা হত ধীরে ধীরে। কারণ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক বিশ্বাস করে, শেষ পর্যন্ত তাঁরা যে কাজ করতে চান তা করতে পারবেন।

গ্রামীণ ব্যাঙ্কের শাখা খোলার জন্যে ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে দু'জন আসতেন। তাঁদের ধরনধারণ, চালচলন ছিল সাদাসিধে। এতই সাদাসিধে যে তাঁদের গ্রামের লোকেরা ভাবত নেহাতই অসহায়, তেমন কোনও সম্বল নেই। তাঁরা জানতেন না তাঁরা কোথায় রাত কাটাবেন, কী খাবেন। সরকারি অফিসারদের চালচলনের সঙ্গে এর বৈপরীত্য এত বেশি যে গ্রামের লোকেরা প্রথমে অবিশ্বাসের, পরে শ্রদ্ধার চোখে এঁদের দেখতেন। সরকারি অফিসারেরা আসতেন আর ভালবাসতেন গুরুত্ব পেতে। নিজেদের তাঁরা অপরিসীম গুরুত্বের মোড়কে মুড়িয়ে রাখতে ভালবাসেন। সরকারি অফিসারেরা ধরেই নেন যে গ্রামের লোকজন

তাঁদের সব ব্যবস্থা করে দেবেন। গ্রামের সব থেকে বড়লোকটির বাড়িতে গিয়ে তাঁদের ভূরিভোজের আয়োজন হয়।

মুহাম্মদ ইউনূসের কাছ থেকে যখন গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সাফল্যের ইতিবৃত্ত শুনি তখন ভাবি এই নোবেল পুরস্কার বিজয়ীর কথা। তাঁর অফিস ঘরটি বড় কিছু নয়, কাঠের সাধারণ চেয়ার আর আসবাব, আলো-হাওয়ার অভাব নেই। নেই কোনও শীতাতপনিয়ন্ত্রিত যন্ত্র। জানলায় গ্রামীণ চেকের পর্দা। তিনি সবসময়ে গ্রামীণ চেকের হাঁটুঝুল পাঞ্জাবি পরেন। তাঁর বাড়িও সাদামাটা। নজরকাড়া কোনও আসবাব নেই। সেখানেও নেই কোনও এয়ারকন্ডিশনার।

তার ম্যানেজাররাও যখন কোনও গ্রামে যান তখন কোনও পরিত্যক্ত বাড়ি, স্কুলের হস্টেল বা স্থানীয় কাউন্সিল অফিসে থাকেন। গ্রামের কোনও বড়লোক যদি তাঁদের কিছু দিতে বা খাওয়াতে আসেন তবে তাঁরা সবিনয়ে তা ফিরিয়ে দেন। এমনকি কোনও সদস্যের বাড়ি গিয়ে গাছের ডাব বা ঘরের গরুর দুধ খাওয়ারও জো নেই তাঁদের। এ-সবই গ্রামীণ ব্যাঙ্কের নিয়মের আওতার মধ্যে পড়ে। তাঁরা তাঁদের নিজেদের রান্না নিজেরাই রেঁধে খান। আর অনভ্যস্ত হাতের রান্না যেমনই হোক তাঁরা এমন ভাব করে খেতেন যেন পরমান্ন খাচ্ছেন!

গ্রামের লোকেরা যখন জানতেন এই সাদাসিধে মানুষ দুটো উচ্চশিক্ষিত, পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন করা তখন তাঁরা অবাক হয়ে যেতেন। গ্রামের স্কুলের শিক্ষকেরা তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ঠিক ধরতে পারতেন। তখন স্কুল শিক্ষকেরা এঁদের সমর্থন না করে পারতেন না। শিক্ষাগত যোগ্যতা স্কুল শিক্ষকদের কাছে সবসময়েই গ্রহণীয়। কারণ তাঁরা চান গ্রামের মানুষ শিক্ষাগত যোগ্যতাকে যথাযথ স্বীকৃতি দিন। এই সব শিক্ষক আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ দেখেননি। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার জন্যে তাঁরা হয়ত উন্মুখ হয়ে ছিলেন কিন্তু অবস্থা তাঁদের সে সুযোগ দেয়নি। তাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজারদের প্রতি তাঁরা সম্মান দেখান।

তাঁরা ভাবতেই পারেন না বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরিয়ে কেউ গ্রামে কী করে কাজ করে! এবং তা-ও আবার গরিব লোকের সঙ্গে। তাঁদের নেই কোনও চেয়ার বা টেবিল বা বড় কোনও অফিস। শুধু মাইলের পর মাইল হাঁটা আর চাকচিক্যহীন কাজ।

গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ম্যানেজাররা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী হয়েও গ্রামে কাজ করছেন, আর সে কাজ তাঁরা করছেন স্বেচ্ছায়— দায়ে পড়ে নয়। এই ভাবনাটা তাঁরা গ্রামের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতেন। সেজন্য এই সব তরুণ ম্যানেজার গ্রামের সম্মান কুড়িয়ে নিতেন অনায়াসে।

এরকমও কখনও কখনও হয়েছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী কেউ ধারেকাছে নেই। দশ মাইলের মধ্যে যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী তিনি গ্রামীণ

ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। গ্রামের লোক মনেই করতে পারেন না তাঁদের কোনও ভূমিপুত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি অতিক্রম করেছেন। যদিও বা করেন তিনি আবার গ্রামে ফিরে এসেছেন এমনটা তাঁদের স্মৃতিতে নেই।

কিন্তু যেই সেই ম্যানেজার কাজে নামতেন মহাজন আর ধর্মীয় নেতারা তাঁদের নামে নানারকম গুজব ছড়াতেন। যেমন, দলের সঞ্চয় হিসেবে যে টাকা ম্যানেজার তুলছেন তিনি সেই টাকা নিয়ে পালাবেন। তাঁর ঋণ দেওয়ার কোনও অভিপ্রায় নেই। যদি থাকত তবে তাঁর নিশ্চয়ই কোনও অফিস থাকত, কর্মচারী থাকত। উনি যদি ম্যানেজারই হবেন তবে উনি নিজে রেঁধে খান কেন, তাঁর থাকার ধরনটাও তো পিয়ন-বেয়ারার মতো। কেউ কখনও শুনেছে এম এ পাস করে নিজের রান্না নিজে করছে? তিনি কেবল মহিলাদেরই ঋণ দেবেন বলে ছুটে বেড়াচ্ছেন কেন? নিশ্চয়ই তাঁর কোনও বদ মতলব আছে। হতেও পারে তিনি চোরাচালানের সঙ্গে যুক্ত, হতে পারে তিনি মধ্য এশিয়ায় মেয়ে পাচার করেন। তিনি মেয়েদের পর্দাপ্রথা তুলে দিয়ে কোনও কারসাজি করতে চান, তিনি ব্যাঙ্ক ম্যানেজার হলে স্থানীয় কাউন্সিল চেয়ারম্যানের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁর মাধ্যমে কাজ করছেন না কেন? তিনি মাইলের পর মাইল হাঁটছেন কী উদ্দেশ্যে?

কিন্তু গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ম্যানেজারেরা এ-সব অযথা বিতর্কে যোগ না দিয়ে বৃষ্টি, জল, ঝড়ে কাজ করতেন। হাঁটতেন। গ্রামের কাদায় তাঁদের পা আটকে যেত। তিনি গ্রামের লোকদের এজেন্ট হিসেবে নিয়োগ করে নিজে আরাম করতেন না, যা করার তা সবটুকু নিজেরা করতেন। এমনকী ধর্মীয় অনুশাসনের ব্যাপারে তিনি এত সুন্দর যুক্তিজাল বিস্তার করতেন যে ধর্মীয় নেতাদের চুপ করে যেতে হত। আর গ্রামীণ ব্যাঙ্কের নিয়মকানুন তিনি শুধু ভাল জানেন তা-ই নয়, কোনটা কেন সে জবাবও তিনি ভাল দিতে পারেন।

অবশেষে তিনি কী বলছেন তা নয়, তিনি কী করছেন তা দেখে গ্রামের মানুষের মন নরম হত। তাঁরা বুঝতেন ম্যানেজারটি নিজের কোনও লাভ করতে গাঁয়ে পা দেননি। গরিব লোকের জন্যে কিছু করাই তাঁর উদ্দেশ্য।

গ্রামীণ ব্যাঙ্কের প্রশিক্ষণ সরল কিন্তু পরিশ্রমসাধ্য। এর সবটাই নিজে শেখ পদ্ধতিতে। গ্রামীণ ব্যাঙ্কের প্রশিক্ষণের জন্য কোনও পাঠ্যপুস্তক নেই। পাঠ্যপুস্তকের থেকে বাংলাদেশের গ্রামই একজনকে অনেক বেশি শেখাতে পারে।

মুহাম্মদ ইউনূস তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছিলেন, 'অর্থনীতির তত্ত্বগুলি কীভাবে সব অর্থনৈতিক সমস্যার সহজ সমাধান করে দেয় এই বিষয় ছাত্রদের পড়াতে পড়াতে আমি রোমাঞ্চ অনুভব করতাম। ...অর্থনীতির এই সব তত্ত্বে কঠোর বাস্তবের প্রতিফলন কোথায়? অর্থনীতির নামে আমি ছাত্রদের কী করে মনগড়া গল্প শোনাব?

...স্থির করলাম আমি আবার নতুন করে ছাত্র হব এবং আমার বিশ্ববিদ্যালয়

হবে জোবরা গ্রাম, গ্রামবাসীরা হবেন আমার শিক্ষক।' তিনি নিজে যা বিশ্বাস করেন ঠিক সেভাবেই তিনি তৈরি করেছেন গ্রামীণ ব্যাঙ্কের কর্মীদের।

গ্রামীণ ব্যাঙ্কে কাজ পাওয়ার জন্যে যে-কোনও বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্স ডিগ্রি থাকা চাই, সেকেন্ড ক্লাস পেলেই চলবে, তবে বয়স হতে হবে সাতাশের নিচে। তা হলে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ম্যানেজার পদে আবেদন করা চলবে। যখন ম্যানেজার পদের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় তখন প্রচুর আবেদনপত্র জমা পড়ে। মুহাম্মদ ইউনূস সবসময়ে ভাবেন এঁদের সকলকেই নিতে পারলে ভাল হত। কিন্তু তার উপায় নেই। যাঁরা আবেদন করেন তাঁদের অন্তত পঞ্চাশ শতাংশ ভাল ম্যানেজার হতেন। কিন্তু গ্রামীণ ব্যাঙ্কের প্রশিক্ষণের সুযোগ সীমিত। তাই ইন্টারভিউ দিয়ে ছেঁকে ছেঁকে কিছু আবেদনকারীকে নেওয়া হয়। ব্যাঙ্ক ম্যানেজার হতে গেলে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাগলেও ব্যাঙ্ককর্মী হতে গেলে দু'বছরের কলেজে পড়ার অভিজ্ঞতা থাকলেই যথেষ্ট। তবে সব পরীক্ষায় ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণী পেতে হবে।

এই যোগ্যতায় বাংলাদেশে চাকরি পাওয়া দুষ্কর। পেতে গেলে আবেদনপত্রের সঙ্গে প্রথমেই টাকা দিতে হয়। সেটা আবেদন-ফি। তার থেকেও বড় কথা বিনা ঘুষে চাকরি পাওয়া সহজ নয়। এক হাজার টাকা থেকে কুড়ি হাজার টাকা পর্যন্ত চাকরি পেতে ঘুষ লাগে। কাউকে কাউকে আবার কারুর মেয়েকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তবে চাকরি পেতে হয়। চাকরির আবেদন করা থেকে শুরু করে ইন্টারভিউতে হাজির হওয়া পুরোটার জন্যে যা খরচ হয় তার জন্যে কাউকে মহাজনের কাছ থেকে টাকা ধার করতে হয়, কাউকে বা বাড়ির গয়না বেচতে হয়। মুহাম্মদ ইউনূস বলছেন, গ্রামীণ ব্যাঙ্কে চাকরি পেতে গেলে কাউকে ঘুষ দিতে হয় না। সরকারি আমলা হোক বা রাজনীতিবিদের সুপারিশ লাগে না। দ্বিতীয় ডিভিশনে স্কুল-কলেজ পাস করে বাংলাদেশে জুনিয়র কেরানি বা অফিস-বয়ের কাজ পাওয়া যায়। কিন্তু ওই একই শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে গ্রামীণ ব্যাঙ্কে চাকরি পেলে সেদিন থেকেই সে হয়ে ওঠে ব্যাঙ্কের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। সে গ্রামে গেলে গ্রামবাসীর সম্মান পায়। সে হয়ে ওঠে তাদের শিক্ষক। মেয়ে ব্যাঙ্ক কর্মীদের নেওয়া হয় স্থানীয় এলাকা থেকে। ছেলেদের কোনও ভৌগোলিক সীমানায় বাঁধা হয় না।

ম্যানেজার হিসেবে যাঁদের নিয়োগ করা হয় তাঁরা প্রশিক্ষণের সময়েই শাখায় যান। সেখানে কীভাবে ব্যাঙ্ক আরও ভাল চলতে পারে তা নিয়ে প্রশিক্ষণ চলাকালেই তুলতে পারেন নানা প্রশ্ন, ওঠাতে পারেন বিতর্ক। ম্যানেজাররা ব্রাঞ্চ খোলার সুযোগ পেলে নিজেদের ব্রাঞ্চ প্রতিষ্ঠাতা মনে করেন এবং চেষ্টা করেন যাতে গ্রামবাসীরা তাঁকে ব্রাঞ্চ প্রতিষ্ঠাতার স্বীকৃতি দেন। প্রশিক্ষণের সময়ে তাঁকে বাধার পাহাড় ডিঙনোর শিক্ষা দেওয়া হয়। তারপর তিনি চান সর্বোচ্চ শিখরে

উঠতে। গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ম্যানেজার পদ তাঁকে সেই সম্মানবোধ দেয়। আর দেয় এক বিরল অনুভূতি: 'কিছুই অসম্ভব নয়'।

গ্রামীণ ব্যাঙ্কের একজন ম্যানেজারের দায়িত্ব যতটা, কাজের পরিধির ব্যাপ্তিও ততটা। তিনি নিজের মতো করে শাখাকে গড়েপিটে নিতে পারেন। তাঁরা গ্রামের মানুষের শিক্ষক। কারণ শিক্ষক তাঁরাই, যাঁরা অন্যের সম্ভাবনাটা কোথায় লুকিয়ে আছে তা খুঁজে বের করেন। খুলে দেন তাঁর অনন্ত সম্ভাবনার দরজাটা, খুঁজে বের করেন তাঁর জোরের জায়গাটা, শুধরে দেন তাঁর দুর্বলতা।

সেই জন্যে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ম্যানেজাররা চট করে চাকরি ছাড়েন না। ছাড়েনও যদি বিদায় নেন চোখের জলে। গ্রামীণ ব্যাঙ্কের প্রতি তার ম্যানেজার ও কর্মীদের এই ভালবাসা গ্রামীণ ব্যাঙ্ককে সাফল্যের চূড়ায় নিয়ে গেছে।

আর গ্রামীণ ব্যাঙ্কের কাজ মহিলাদের দেয় সম্মান ও গুরুত্ব। একজন মেয়ের পক্ষে গ্রামীণ ব্যাঙ্কে কাজ করাটাই সাহসের পরিচায়ক। সাধারণ মানুষ একটা মেয়েকে অফিসে কাজ করতে দেখলেই বিস্মিত হন, সেখানে গ্রামে কয়েক মাইল হেঁটে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের কাজ করার কথা ভাবাও মুশকিল। প্রথম প্রথম গ্রামীণ ব্যাঙ্কে মেয়েরা কাজ করছে তা দেখতেই ভিড় হত। এখনও বাংলাদেশে মেয়েরা অফিসে কাজ করছে জানলে ধর্মীয় নেতারা ভুরু কোঁচকান।

তবু তার মধ্যেই সময়টা পাল্টেছে। একজন অবিবাহিতা মেয়ে গ্রামীণ ব্যাঙ্কে কাজ করলে এক দিকে তার ওপর বিয়ে করার চাপ কমে, অন্য দিকে ভাল বিয়ের সম্ভাবনা বাড়ে। সে তার আয়ের অংশ পরিবারে দেয়। আর সে বাড়ির বোঝা থাকে না, হয়ে ওঠে বাড়ির 'ধন'। পুরুষের সঙ্গে তার কাজ সবসময়ে তুলনা করে দেখা হয় বলে সে যে কাজে দক্ষ তার প্রমাণ দিতে নিত্য চেষ্টা করে। সেই চেষ্টাই তাকে দক্ষতার শীর্ষে নিয়ে যায়। শাখায় তার নাম হয়, সেই শাখা অন্য পুরুষ পরিচালিত শাখার থেকে এগিয়ে যায়। এই সংস্থায় যে-সব মহিলা কাজ করেন তাঁরা সংস্থা থেকে সম্মান পান, সমাজেও তারা সম্মানিত। এখন তাই আবেদনকারীদের মধ্যে অনেকেই মহিলা।

গ্রামীণ ব্যাঙ্ক দাঁড়িয়ে আছে বিকেন্দ্রীকরণ নীতির ওপর। এই ব্যাঙ্কে গঠন করা আছে কেন্দ্র। সেই কেন্দ্রের মধ্যে আবার রয়েছে কেন্দ্র। প্রতিটি কেন্দ্র স্বয়ংসম্পূর্ণ। কিন্তু সেটি আর একটি বড় কেন্দ্রের আওতাধীন। সব থেকে বড় কেন্দ্র হচ্ছে ঢাকার সদর দপ্তর। আর সব থেকে ছোট কেন্দ্র হচ্ছে পাঁচজনের দল বা গোষ্ঠী। সেই দল একটি বড় কেন্দ্রের আওতায়, বড় কেন্দ্র আবার শাখার আওতায়, শাখা এরিয়া অফিসের আওতায় কাজ করে, এরিয়া অফিস বা এলাকাস্থিত অফিস কাজ করে অঞ্চলের আওতায়। অঞ্চল সরাসরি সদর দপ্তরের আওতায়। এইভাবে ওপর থেকে নিচে কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়। নিচের কেন্দ্র সেই দায়িত্ব পুরোপুরি সামলাতে পারছে কি না বা ঠিক করে কাজ করছে কি না তা ওপর থেকে

সবসময়ে দেখা হয়। কখনও কখনও প্রয়োজনে ওপরের কেন্দ্র নিচের কেন্দ্রকে তার কাজে সাহায্য করে। সম্পর্কটা বসের নয়, সম্পর্কটা দাঁড়িয়ে আছে সাহায্যের ওপর। বড় কেন্দ্র সাহায্য ও সহমর্মিতার মনোভাব নিয়ে ছোট কেন্দ্রের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। গ্রামীণ ব্যাঙ্কে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের মধ্যেও এই সহমর্মিতার মনোভাব ছড়িয়ে দেওয়া হয়। সেজন্যে এখানে কেউ সেই অর্থে 'বস' নন।

প্রয়োজন না হলে কোনও কেন্দ্র তার নিচের কেন্দ্রের কাজে নাক গলায় না। শাখাগুলো কাজ করে নিজেদের মতো করে। সেখানে বিনা প্রয়োজনে এলাকা অফিস নাক গলায় না, বলে দেয় না কী করে কী করতে হবে। সেজন্যেই ব্যাঙ্কে ঢোকার আগে প্রশিক্ষণটা এত জরুরি। এরিয়া অফিস বা এলাকা অফিস অঞ্চল অফিসের বা অঞ্চল কেন্দ্রের চাপাচাপি ছাড়াই কাজ করে ফেলে। অঞ্চল কেন্দ্রও তাদের কাজে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ভোগ করে। কোনও কেন্দ্রই চায় না রোজকার কাজ নিয়ে তার ওপরের কেন্দ্র কথা বলুক। এমনকি সদর দপ্তরের কথা বলাও পছন্দ করে না আঞ্চলিক কেন্দ্র। সেইভাবেই আঞ্চলিক কেন্দ্র কাজ করে।

তাদের স্বায়ত্তশাসনের অধিকারে যাতে ওপরের স্তর হস্তক্ষেপ না করে সেজন্যে সব কেন্দ্রকে কাজও করতে হয় প্রচুর। কোনও ভুল করলেই ওপরের স্তর থেকে ডাক আসে। কারণ ওপরের স্তর নিচের কেন্দ্রের কাজে হস্তক্ষেপ না করলেও সবসময়ে কাজের মনিটরিং করে, খেয়ালে রাখে কাজ ঠিকঠাক হচ্ছে কিনা। ওপরের স্তর যেন বিমানের কন্ট্রোল টাওয়ার। কন্ট্রোল টাওয়ারের নির্দেশে বিমান চলে। বিমান নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছনোর জন্যে কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে সব নির্দেশ, পরামর্শ পায়, কিন্তু বিমানটি চালান পাইলটই— কন্ট্রোল টাওয়ার নয়। কিন্তু যখন বিমান বিপদে পড়ে তখন কন্ট্রোল টাওয়ার আরও সক্রিয় হয়ে ওঠে, গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে যা কিছু করার করে। ওপরের কেন্দ্রের সঙ্গে নিচের কেন্দ্রের সম্পর্কটা ঠিক এরকম।

গ্রামীণ ব্যাঙ্কের যাঁরা পাইলট তাঁদের বারবার নিজেদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া হয়। যিনি পাইলট তাঁর কো-পাইলট, নেভিগেটর বা অন্য ক্রু-দের সম্পর্কে অভিযোগ থাকতে পারে, কিন্তু কাজ করিয়ে নেওয়ার, কাজ করার দায়িত্ব তাঁরই। কোনও শাখা ভাল কাজ করলে সদর দপ্তর থেকে শাখা ম্যানেজারের কাছে অভিনন্দনপত্র যায়। তখন এরিয়া ম্যানেজার বা তাঁর বসকে অভিনন্দন জানানো হয় না। এরিয়া ম্যানেজার পান শুধু অভিনন্দনপত্রের কপিটি। কিন্তু শাখায় ভুল হলে ধমক খান এরিয়া ম্যানেজার। তখন আর শাখা ম্যানেজারকে ধমক দেওয়া হয় না।

এরিয়া অফিস, জোনাল অফিস আর সদর দপ্তর মিলিয়ে তৈরি হয় সুপারভাইজরি অফিস। সঠিক মানে কাজ হচ্ছে কিনা তার তদারকি করে সুপারভাইজরি অফিস। সব কেন্দ্রের কাজের তদারকি করাই সুপারভাইজরি

অফিসের কাজ। সুপারভাইজরি অফিস সব কেন্দ্রের তথ্য হাতে নিয়ে বসে থাকেন। হাতে সব তথ্য থাকলেই রোজকার কাজে আর হস্তক্ষেপ করতে হয় না। কাজ কতটা এগোচ্ছে, কোথায় অসুবিধে এ-সব তথ্য হাতে থাকলে আর রোজকার কাজে হস্তক্ষেপের প্রয়োজন পড়ে না।

মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, এখন যাঁরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের উচ্চপদের অফিসার তাঁরা বেশিরভাগই ইউনূসের ছাত্র ছিলেন। ইউনূস যখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াচ্ছেন, তখন তাঁরা ছাত্র। আজও তাঁকে সবাই 'স্যার' বলেই সম্বোধন করেন। যাঁরা নতুন আসছেন, তাঁরা সরাসরি ইউনূসের ছাত্র না হলেও তাঁদের মধ্যে সম্পর্কটা 'শিক্ষক-ছাত্রের'। সম্পর্কটা বস আর কর্মীর নয়। কোম্পানির সি ই ও হওয়ার থেকে 'স্যার' হতেই মুহাম্মদ ইউনূসের বেশি ভাল লাগে। ফলে, সম্পর্কটা অনেক সহজ। বসের সঙ্গে কর্মীদের সম্পর্ক আনুষ্ঠানিক, কিন্তু শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্কটা অনেক সরল পথে এগোয়। কারও কোনও ত্রুটি থাকলে বা দুর্বলতা থাকলে তিনি তা তাঁর বসের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখেন, কিন্তু শিক্ষকের কাছে তিনি দুর্বলতা খুলে বলেন, যাতে শিক্ষক শুধরে দেন। এমনকি ভুল করলেও তিনি শিক্ষকের কাছে তা স্বীকার করেন, কারণ তিনি জানেন তাঁর শিক্ষক তাঁর বস নয়, অতএব 'ফায়ার' করার ঘটনাও ঘটবে না। যেহেতু ব্যাঙ্কের শীর্ষপদের মানুষটি একজন শিক্ষক তাই নিচেও সেই সম্পর্ক গড়ে উঠেছে কেন্দ্রে কেন্দ্রে। 'আমি একজন শিক্ষক' এই হচ্ছে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের স্লোগান।

একজন আমলার দরকার একটি অফিসের। সঙ্গে থাকে কাগজপত্র, ফাইল, ডেস্ক, চেয়ার। এ-সব অনুষঙ্গ ছাড়া তাঁকে মানায় না। আর একজন শিক্ষককে দেখুন। অনুষঙ্গ ছাড়াও তিনি শিক্ষকই থেকে যান।

সময় বদলাচ্ছে। গ্রামীণ ব্যাঙ্কের কাজের পরিধি বাড়ছে। সেজন্যে গ্রামীণ ব্যাঙ্ককে সবসময়ই তাদের সিদ্ধান্তগুলিকে সেই বদলানো সময়ের নিরিখে দেখতে হচ্ছে। দরকারে অদলবদল করতে হচ্ছে। আর নিতে হচ্ছে নতুন সিদ্ধান্ত। গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সদস্যদের কীভাবে বদলে দেবে সেই সব সিদ্ধান্ত সেদিকে সতত নজর রাখতে হয়। গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সিদ্ধান্ত বদলের ওপর নির্ভর করে গ্রামের মানুষের জীবন। সেই জন্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া বা বদল করার আগে তাঁদের পেরোতে হয় অনেকগুলো চিন্তার ধাপ।

গ্রামীণ ব্যাঙ্ক যখন ছোট ছিল তখন একজনের সঙ্গে আর একজনের সম্পর্ক রাখা সহজ ছিল। কিন্তু এখন গ্রামীণ ব্যাঙ্ক অনেক বড় হয়েছে। সবার সঙ্গে সবার ব্যক্তিগত সম্পর্ক রাখা এখন দুরূহ নয়, অসম্ভব।

কিন্তু সদর দপ্তর কখনই এককভাবে কোনও সিদ্ধান্ত নেয় না। যখনই কোনও নতুন নিয়ম চালু, নীতিপ্রণয়ন বা পুরনো নীতি বদলের কথা মনে হয়, তখন তার একটা খসড়া তৈরি করে ফেলা হয়। তারপর সেই খসড়া সব বিভাগীয় প্রধান,

জোনাল ম্যানেজার বা আঞ্চলিক ম্যানেজারের কাছে পাঠানো হয়। তাঁদের মন্তব্য চাওয়া হয়। যদি সেই সব নীতি বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয় তবে তা এলাকা বা এরিয়া ম্যানেজারদের কাছেও পাঠানো হয়। তাঁরা তাঁদের মতামত সদর দপ্তরে পাঠিয়ে দেন। যদি দেখা যায় বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা হলে তাঁরা আবার সেটি নিয়ে নিজেদের অফিসে আলোচনা করেন। যুক্তিতর্ক হয়। সমস্ত মতামত, যুক্তি পাওয়ার পর খসড়া যায় স্ট্যান্ডিং কমিটির কাছে। এই স্ট্যান্ডিং কমিটিকে খসড়া কমিটিও বলা হয়। সব মতামত নেওয়ার পর যা যা গ্রহণযোগ্য তা নিয়ে দ্বিতীয় খসড়া তৈরি হয়। খসড়াটি আবার বিলি করা হয়। তখন যদি তাতে বেশির ভাগের সম্মতি পাওয়া যায় তা হলে শেষ পর্যন্ত সেটাকেই গৃহীত নীতি হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া হয়। কিন্তু যদি তাতে বেশির ভাগের সম্মতি না পাওয়া যায় তবে খসড়াটিকে আবার অনুমোদনের জন্য বিলি করা হয়। আগের পদ্ধতি পেরিয়ে সম্মতি পেলে তখন তা চূড়ান্ত রূপ পায়।

যদি সব কিছুর পরও কোনও চূড়ান্ত নীতি প্রণয়ন করা না যায় তবে খসড়াটিকে জোনাল ম্যানেজারদের সম্মেলনে পেশ করা হয়। বছরে তিনবার জোনাল ম্যানেজারদের সম্মেলন হয়। সেখানে চূড়ান্ত ফয়সলার জন্য ইস্যুটি তোলা হয়। জোনাল ম্যানেজারদের সম্মেলনে উদ্ভাবনী ভাবনার ওপর জোর দেওয়া হয়। সব থেকে মজার কথা, জোনাল ম্যানেজার সম্মেলনে সদর দপ্তরের কেউ জোনাল ম্যানেজারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলতে পারেন না, আঙুল তুলতে পারেন না বা অসন্তোষ প্রকাশ করতে পারেন না, কাজ না করার দুর্নামও চাপাতে পারেন না। কিন্তু জোনাল ম্যানেজাররা সদর দপ্তরের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ বা অসন্তোষ থাকলে তা বলতে পারেন নিঃসঙ্কোচে। তখন সদর দপ্তরকে নিজেদের অবস্থান বুঝিয়ে বলতে হয়। মোটের ওপর, জোনাল ম্যানেজাররা সওয়াল করলে সদর দপ্তরকে তার জবাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়।

আবার এক জোনের সঙ্গে অন্য জোনের কথাবার্তা চলে। তখন বিভিন্ন জোনকে তথ্য দিয়ে বোঝাতে হয় তাঁর জোন অন্য জোনের থেকে এগিয়ে। তিনি কম যান না, বরং বেশি দক্ষ।

এই সময়ে সদর দপ্তর আলোচনায় অংশ নেয়। হাতে তথ্য নিয়ে বুঝিয়ে দেন কেন অমুক জোন আর একজনের থেকে ভাল, কোথায় অমুকের ত্রুটি। তখন ওপরওয়ালা হিসেবে নয়, সহকর্মী ও সহমর্মী হিসেবে সদর দপ্তর অন্য জোনকে এগিয়ে যাওয়ার, ত্রুটি সংশোধনের পরামর্শ দেয়। তবে সেই পরামর্শ নেওয়া বা না নেওয়া নির্ভর করে জোনের ওপর। পরামর্শ নেওয়া বাধ্যতামূলক নয়। সমাধান সূত্র পছন্দ হলে জোন তখনই সেটা নিয়ে নেয়। জোন জানে কোন সমাধান তার অঞ্চলের পক্ষে উপযোগী।

গ্রামীণ ব্যাঙ্কের মনিটরিং ও ইভ্যালুয়েশন বিভাগ আছে। সেই বিভাগ প্রতিটি

জোনের কাজ খতিয়ে দেখে। শুধু তাই নয়, জোনগুলোর মধ্যে তুলনামূলক তথ্যও পাশাপাশি রাখে। বিশ্লেষণ যাতে সুষ্ঠু, তথ্যবহুল ও সঠিক হয় তার জন্য মনিটরিং ও ইভ্যালুয়েশন বিভাগ যেমন নজর রাখে, তেমনি জোনাল অফিসগুলিও দৃষ্টি রাখে।

সজীব বিতর্ক, স্বাস্থ্যকর সমালোচনার মধ্যে দিয়ে যখন জোনাল ম্যানেজারদের সম্মেলন শেষ হয় তখন অনেকেই বোঝেন তাঁদের দুর্বলতা কোথায়, জোরের জায়গাটাই বা কোথায়। এরপর তাঁরা ফিরে গিয়ে আবার নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করেন। জোনাল ম্যানেজাররা এই সম্মেলনকে একটা ডাকনামে ডাকতে পছন্দ করেন— 'ব্যাটারি-রিচার্জিং সম্মেলন'। জোনাল ম্যানেজাররা 'রিচার্জড' হওয়ার পর আরও ভাল করে কী করে ব্যাঙ্ক চালানো যায় তার চেষ্টা করেন।

ফিরে গিয়ে তাঁরা ডাকেন এরিয়া ম্যানেজারদের সম্মেলন। এরকম করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সবাইকে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয় বলে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের মধ্যে নানা বিতর্কের অবসান হয়, টেনশন থাকে না। গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সবাই জানতে পারেন কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছ এবং কেন এ-সব সিদ্ধান্ত হল।

সমস্যা সমাধানের মনোভাব নিয়ে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের কর্মীরা কাজ করেন। কোনও সমস্যার সমাধান হয় না— এ কথা তাঁরা মানেন না। সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের এক ডজন মতাদর্শ আছে। এই সব মতাদর্শ আসলে কেবল গ্রামীণ ব্যাঙ্ক নয়, জীবনে কাজের ক্ষেত্রেও লাগানো যেতে পারে। এটাই তাঁর দর্শন।

এক ডজন পরামর্শ

১। প্রতিটি সমস্যার একটা সমাধান আছে। আসলে সমস্যা আর সমাধান একই পয়সার দুই পিঠ।

২। সমস্যা হচ্ছে অর্ধসত্য। সমস্যা আর তার সমাধান মিলে হয় পুরো সত্যটা। পুরো সত্যের দিকে ছুটতে হবে।

৩। যদি আপনি কোনও সমস্যার সমাধান না পান তা হলে তার মানে এই যে আপনি সমস্যাটা পুরোটা বোঝেননি।

৪। যদি আপনি সমস্যাটা পুরো বোঝেন তার মানে এই যে আপনি সমাধানের পথে অর্ধেকটা এগিয়েছেন।

৫। সমাধানের জন্ম সমস্যার জঠরে। তাই টেস্টটিউব সমাধান কোনও চিরস্থায়ী সমাধান নয়।

৬। সমস্যা আর তার সমাধান অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, দুটোকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

৭। সমস্যা সমাধানের আগে পুরো সমস্যাটা ভাল করে অনুধাবন করতে

হবে। সমস্যা যেন পীড়ন করে। তবেই সমাধানের পথ খুঁজতে গেলে ঠিক দিশা মিলবে।

৮। আপনি সমস্যার যত গভীরে যাবেন ততই সমাধান আসবে আপনার হাতের মুঠোয়। এটাই সমাধানের রাস্তা।

৯। আমি আপনার সমস্যার সমাধান করতে পারি না, আপনিও আমার সমস্যার সমাধান করতে পারেন না। যদি আমি আপনার সমস্যার সমাধান করে থাকি তবে জেনে রাখবেন আপনার সমস্যাকে আমি নিজের বলে ভেবেছি বলেই তা করতে পেরেছি।

১০। যেখানে সমস্যা, সমাধান সেখানেই রয়েছে। সুতরাং সমাধান খুঁজতে দূরে কোথাও যেতে হবে না।

১১। একটা সমস্যার হয়ত অনেকগুলো সমাধান আছে। তার মধ্যে যেটা সব থেকে ভাল সেটাকেই বেছে নিতে হবে। সেটাই আসল সমাধান।

১২। কয়েকটা ঘটনাবলি সমস্যার জন্ম দেয়। সেই সমস্যাকে যদি এড়িয়ে চলতে হয়, তবে অন্য ঘটনাবলির দিকে মোড় ঘুরিয়ে দিতে হবে।

গ্রামীণ ব্যাঙ্কের কর্মীদের সবসময়েই এটা বোঝানো হয় সমস্যার মধ্যে নিহিত আছে রোমাঞ্চ। কারণ প্রতিটি সমস্যার সমাধানের পেছনে লুকিয়ে আছে আপনার বুদ্ধি, বিবেচনা।

গ্রামীণ ব্যাঙ্কের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে টাঙানো আছে একটা স্লোগান: 'আমাদের সৃষ্টিশীল হতে হবে। সৃষ্টিশীল হওয়ার জন্যে সবকিছু ভাল করে যাচিয়ে নিতে হবে এবং চোখে যা দেখছি তা ভালভাবে পরখ করে নিতে হবে।'

যিনি প্রথম গ্রামীণ ব্যাঙ্কে প্রশিক্ষণ নিতে আসেন তাঁকে গোড়াতেই জিজ্ঞেস করা হয়, কী করলে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের আরও উন্নতি হবে। তিনি বেশ থতমত খেয়ে যান। তিনি এসেছেন শিক্ষার্থী হয়ে, অথচ তাঁকে এমন প্রশ্ন করা হচ্ছে যেন উনি শিক্ষক। তখন তাঁকে বিভিন্ন শাখায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তিনি সেই শাখার কাজের ফাঁকফোকর খোঁজেন। সেই ফাঁকফোকর ভরাটের সুযোগই তাঁকে জবাবটা দিয়ে দেয়।

শিক্ষার্থীদের প্রথমেই একটা জিনিস বলে দেওয়া হয়— নিয়মকানুনের থেকেও গ্রামীণ ব্যাঙ্কের লক্ষ্যে স্থির থাকা বা লক্ষ্যে পৌঁছে যাওয়া বেশি গুরুত্বপূর্ণ। লক্ষ্য যদি ঠিক থাকে তবে যে কেউ নিয়মকানুন, পদ্ধতি বদলের ক্ষেত্রে বড় প্রস্তাব দিতে পারেন। যাঁরা শিক্ষার্থী তাঁদের বলা হয় শাখা ম্যানেজার এবং ব্যাঙ্ককর্মীদের প্রস্তাব অনুযায়ী অতীতে গ্রামীণ ব্যাঙ্কে কত বদল এসেছে। যাঁরা সদর দপ্তরে কাজ করেন তাঁদের থেকেও যাঁরা মাঠেঘাটে কাজ করেন তাঁরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের নিয়মকানুন পদ্ধতিতে বদল এনেছেন বেশি। তাঁদের বলে দেওয়া হয় গ্রামীণ ব্যাঙ্কের মূল সম্পদ তার সদস্যরা, তার গ্রামের মানুষ, তার নিয়মকানুন নয়।

গ্রামীণ ব্যাঙ্ক একধাঁচে সবাইকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথা ভাবে না। হাতের পাঁচটি আঙুলের মতো তাঁরা আলাদা, তাঁদের ভাবনাচিন্তাও আলাদা। এই আলাদা হওয়া, ব্যতিক্রমী হওয়া, অন্যরকম হওয়াকে গুরুত্ব দেয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক। গ্রামীণ ব্যাঙ্ক বৈচিত্র্যকে সম্মান দেয়, অভিবাদন জানায়। গ্রামীণ ব্যাঙ্ক কারও ধর্ম বা রাজনৈতিক পছন্দ-অপছন্দের ওপর হাত বাড়ায় না। এ ব্যাপারে প্রত্যেকের স্বাধীনতা থাকুক— এটাই গ্রামীণ ব্যাঙ্ক বিশ্বাস করে। গ্রামীণ ব্যাঙ্ক মনে করে সবাই যেন রাজনৈতিকভাবে ও সামাজিকভাবে সচেতন হয়।

গ্রামীণ ব্যাঙ্কে যাঁরা কাজ করতে আসেন, তাঁদের সকলের সঙ্গে দারিদ্র্যের পরিচয় থাকে না। গ্রামে গিয়ে তাঁরা বোঝেন দারিদ্র্য কী। তখন তাঁদের বলা হয়, দারিদ্র্য হচ্ছে তাঁদের শত্রু। এই শত্রুর বিরুদ্ধে লড়তে হবে বিশ্বস্ত সৈনিকের মতো। এর জন্য গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সাংগঠনিক শক্তি ও ঋণ তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই দুটোই তাঁদের দারিদ্র্য যন্ত্রণা মোকাবিলার যন্ত্র।

গ্রামীণ ব্যাঙ্ক যেভাবে কাজটা করছে সেটাই দারিদ্র্য মোকাবিলার একমাত্র পথ না হতেও পারে। এর জন্য অন্য পথ থাকতে পারে বা বিকল্প পথ থাকতে পারে। দারিদ্র্য ঘোচানোর জন্য তাঁরা পথের অনুসন্ধান করতেই থাকুন। স্বাধীনতা, সহনশীলতা, বৈচিত্র্য, ঔৎসুক্যের মাঝে উদ্ভাবনী ক্ষমতা জন্ম নেয়। চিন্তার কাঠিন্য, স্থিতিশীলতা উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে নষ্ট করে দেয়। গ্রামীণ ব্যাঙ্ক তাদের জোনাল ম্যানেজারদের উদ্ভাবনী শক্তির ওপর আস্থা রাখে। সেই শক্তি থেকে যদি কোনও পদ্ধতি বেরিয়ে আসে বা বদল বেরিয়ে আসে তবে তাঁরা সদর দপ্তরের আগাম অনুমোদন ছাড়াই তা প্রয়োগ করতে পারেন। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে দুটি শাখায় তাঁরা তা প্রয়োগ করতে পারেন। একসঙ্গে সব শাখায় তা প্রয়োগের অনুমতি দেওয়া হয় না। কারণ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ধীরস্থিরভাবে এগনোতেই বিশ্বাসী। যদি সেই পরীক্ষা উতরে যায় তবে তাঁরা তা সদরে জানাবেন। কিন্তু পরীক্ষা সফল না হলে তা সদরে জানানোর দরকার নেই।

এক অঞ্চলে কোনও পরীক্ষা সফল হলেই তা যে অন্য অঞ্চলকে নিতে হবে এমন কোনও মানে নেই। সেই পরীক্ষা প্রয়োগ করা হবে কি না তা নির্ভর করবে অন্য অঞ্চলের জোনাল ম্যানেজারের ওপর। প্রতিটি অঞ্চলের জোনাল ম্যানেজার তাঁর অঞ্চল নিয়ে বলতে গেলে বেশ গর্ববোধ করেন। জোনাল ম্যানেজারদের সম্মেলনে সেই গর্বের আস্বাদ মেলে।

বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান, বাৎসরিক সমাবেশ, ব্যায়াম— এই তিনটে জিনিসই অঞ্চল বা জোন থেকে প্রথম এসেছে। মুহাম্মদ ইউনূস ভাল করেই মনে করতে পারেন এই তিনটে জিনিসের মধ্যে দিয়ে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ও তার সদস্যরা পরস্পরের কাছাকাছি এসেছে।

বিভিন্ন গ্রামের দলের সদস্যদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে শাখা প্রতি বছর

বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা করে।

শাখায় বাৎসরিক সমাবেশ হয়— শাখার জন্মদিনে। একটি শাখা যেদিন তার প্রথম ঋণ দিয়েছে গ্রামের দলকে, সেদিনটাই তার জন্মদিন।

শাখার আওতায় সব দল সেদিন মিলিত হয়— একটি বিশেষ জায়গায়। তারপর সারাদিন ধরে চলে গল্প, আড্ডা, গান, নাটক, খেলা— আরও কত মজা। সেই মজার মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসে প্রতিশ্রুতি— আরও আয় করার, আরও উজ্জ্বল দিনের প্রতিশ্রুতি।

একজন শাখা ম্যানেজার গ্রামীণ দলের সদস্যদের ব্যায়ামের রুটিন রাখলেন। তখন অন্য শাখা, অন্য অঞ্চল একে ভাল চোখে দেখেননি। তাঁরা ভাবলেন এর মধ্যে দিয়ে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক যে বেশি কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে দিয়ে সদস্যদের নিয়ে যেতে চায় তা প্রমাণিত হবে। কিন্তু অন্য শাখা, জোনের কথা সত্যি হল না। সেই শাখার আওতায় যত সদস্য আছে তাঁরা কাকভোরে উঠে ব্যায়াম, কুচকাওয়াজ করতে লাগলেন। যথেষ্ট উৎসাহের সঙ্গেই। এরপর শারীরিক কসরত, শারীরিক সুস্থতাও গ্রামীণ ব্যাঙ্কের কর্মসূচির আওতায় চলে এল। তার আগে জোনাল ম্যানেজার অন্য শাখার ম্যানেজারদের সেই গ্রামে গিয়ে ব্যায়াম ও কুচকাওয়াজ দেখতে বললেন। তাঁরা স্বচক্ষে দেখলেন কেমন করে গ্রামের লোকেরা ব্যায়াম আর কুচকাওয়াজে যথেষ্ট আগ্রহী হয়ে পড়েছে। তখন সেই জোনাল ম্যানেজার অন্য শাখা ম্যানেজারদের তাঁদের শাখায় শারীরিক কসরত চালু করতে বললেন। শেষ পর্যন্ত বেশিরভাগ শাখাতেই ব্যায়াম, কুচকাওয়াজ চালু হল। একজন শাখা ম্যানেজার নতুন কিছু করার কথা ভেবেছিলেন। তার থেকেই এর জন্ম। ব্যায়াম, শারীরিক কসরত তাঁদের স্বাস্থ্য ঠিক রাখে।

কারও মাথায় কোনও নতুন ভাবনা এলে তাঁরা সরাসরি ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা মুহাম্মদ ইউনূসকে তা লিখতে পারেন। নতুন চিন্তা ফেলে রাখার জন্য নয়, যে, অফিসের পদ অনুযায়ী তা পাস হতে হতে শেষ অবধি মুহাম্মদ ইউনূসের হাতে তা পৌঁছবে। নতুন ভাবনা— সে আসুক তাড়াতাড়ি, হাওয়া গাড়ি চড়ে। একেবারে নোবেল বিজয়ীর হাতে।

গ্রামীণ ব্যাঙ্কের দলের অধিকাংশই মহিলা ফলে সমাজের এবং অর্থনীতির গোড়ায় ধাক্কা দেওয়া গেছে। আমরা এতদিনে জেনে গেছি গ্রামীণ ব্যাঙ্ক যাদের ঋণ দেয় তাদের ছিয়ানব্বই শতাংশ মহিলা। গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাজ করে অন্যান্য ব্যাঙ্ক। কিন্তু গ্রামীণ ব্যাঙ্কের শাখা, এরিয়া অথবা জোনকে ভাল কাজ করছে বলে তখনই স্বীকৃতি দেওয়া হয় যখন দেখা যায় অন্য ব্যাঙ্কের থেকে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের মহিলা সদস্যের সংখ্যা বেশি।

মুহাম্মদ ইউনূসের মতে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক এভাবে চলে বলেই গ্রামীণ ব্যাঙ্ক সফল। এর পেছনে নেই কোনও জাদু বা রহস্য। সবটাই পরিশ্রম, নিষ্ঠা আর নতুন

চিন্তাভাবনার ফল। তবে নোবেল পুরস্কার এখন এর অগ্রগতি বাড়িয়ে দেবে। যাঁরা বিরোধিতা করতেন তাঁদের মুখ বন্ধ করে দেবে চিরতরে। প্রথম দিকে জগদ্দল পাথরটাকে সরাতে অনেক পরিশ্রম হয়েছে, অনেক অকথা-কুকথার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। সে দিন আর নেই। এখন শুধু এগিয়ে যাওয়া যেদিন বাংলাদেশের সব পরিবারে একজন করে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সদস্য হবেন।

ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট হুগো শাভেজের সঙ্গে।

বেড়ে ওঠা

মুহাম্মদ ইউনূসের জন্মদিন ২৮ জুন। সালটা ১৯৪০। চট্টগ্রাম শহর থেকে সাত কিলোমিটার দূরে বাথুয়া গ্রামে তিনি জন্মান। এই বাথুয়া গ্রামেই রয়েছে ইউনূসের আদিবাড়ি। এখানে তাঁদের জমি ও খামার ছিল। কিন্তু তাঁর বাবা দুলা মিয়াঁ হাইস্কুল শেষ করার আগেই পড়া ছেড়ে স্বর্ণ ব্যবসায় যোগ দেন।

ইউনূসরা নয় ভাইবোন। তাঁর মা সুফিয়া খাতুন চোদ্দটি সন্তানের জন্ম দেন। কিন্তু পাঁচটি সন্তান শিশুকালেই মারা যায়। এখন আছেন তাঁর বড় ভাই সালাম, ইউনূস, ইব্রাহিম, মঈনু, জাহাঙ্গির, আজম, আয়ুব, বড় বোন মমতাজ, ছোট বোন টুনু। এঁদের মধ্যে ছোট ভাই জাহাঙ্গির সাংবাদিক। তিনি এখন ইউনূসের সঙ্গে কাজ করেন।

চট্টগ্রাম শহরের ২০ বক্সিরহাট রোডে বেড়ে উঠেছেন ইউনূস। এই বাড়িটির দোতলায় থাকতেন দুলা মিয়াঁ সপরিবারে। আর নিচে ছিল তাঁর গহনার দোকান। পেছনের অংশে ছিল কারিগরদের জায়গা।

২০ বক্সিরহাট রোডের দোতলায় ছিল চারটি ঘর এবং একটি রান্নাঘর। বড় ঘরটি ছিল ইউনূস এবং তাঁর ভাইবোনদের থাকার ঘর। সবাই একসঙ্গে এখানে শুতেন। তিনতলায় রেলিং ঘেরা ছাদ ছিল ইউনূসদের খেলার জায়গা। যখন একঘেয়ে লাগত তখন তাঁরা এখানে আসতেন।

বাবা দুলা মিয়াঁ মণিকার হিসেবে চট্টগ্রামে সুনাম কুড়িয়েছিলেন। ব্যবসার কাজে ব্যস্ত থাকতে হত বলে তিনি সংসারের খুঁটিনাটি বিষয়ে খোঁজ রাখতে পারতেন না। তবে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার ব্যাপারে তিনি নিয়মিত খোঁজখবর করতেন।

ইউনূস প্রথমে বাড়ির কাছে লামারবাজার অবৈতনিক প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি হন। তাঁর অধিকাংশ সহপাঠী ছিল শ্রমজীবী মানুষের ছেলেরা। সেই স্কুলে তিনি

রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের কবিতা পড়েন। তখন তাঁর বয়স খুবই অল্প।

সেটা ১৯৫১-৫২ সালের ঘটনা। ইউনূস এম ই স্কুল থেকে চট্টগ্রামের কলেজিয়েট স্কুলে এসে ভর্তি হলেন। ক্লাস সেভেনে। চিত্তপ্রসাদ তালুকদার তখন সেই স্কুলে তাঁর ক্লাস টিচার। ইউনূস স্কাউট, বিতর্ক, দেওয়াল পত্রিকায় লেখালেখি সব বিষয়ে এগিয়ে যেতেন। এখানকার স্কাউট-ডেন ছিল পড়ার বইয়ের গণ্ডির বাইরের জগতের সিংহদ্বার। স্কাউট হিসেবে ইউনূস গ্রামে গ্রামে ঘুরে ক্যাম্প করতেন। ক্যাম্প ফায়ারের বিচিত্রানুষ্ঠানে অংশ নিতেন। 'উপার্জন সপ্তাহ'-এ রাস্তায় ফেরি, জুতো পালিশ, কিংবা চায়ের দোকানে বেয়ারার কাজ করে টাকা তুলতেন। স্কাউটিং তাঁকে উদার করে, শেখায় কোনও কাজই ছোট নয়। নিজেকে অন্যদের থেকে সেরা বলেও প্রমাণ করতেন। কিন্তু এম ই স্কুলে তিনি যেমন ক্লাসে প্রথম হতেন, কলেজিয়েট স্কুলে এসে তিনি প্রথম হতে পারছিলেন না। তখন বাবা দুলা মিয়াঁ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। একদিন তিনি ক্লাস টিচার চিত্তপ্রসাদ তালুকদারের সঙ্গে কথা বললেন। বললেন,

— মাস্টারবাবু, আপনাকে আমার ইউনূসকে পড়াতে হবে।

উত্তরে চিত্তপ্রসাদ স্যার বললেন,

— সে তো ভাল ছাত্র, তাকে বাড়িতে এসে পড়াতে হবে কেন?

— ইউনূস যে এখন আর ক্লাসে ফার্স্ট হয় না। আমি চাই আমার ছেলে যেন প্রতি ক্লাসেই ফার্স্ট হয়।

— আপনার এ ছেলে একদিন প্রথম হবেই। এ নিয়ে আপনি আর ভাববেন না।

এর কয়েক বছর পর চিত্তপ্রসাদ তালুকদার এম ই স্কুলে বদলি হয়ে যান। তাই ইউনূসের বাবা তখনকার দিনে একশো টাকা বেতনে চিত্তপ্রসাদ তালুকদারকে গৃহশিক্ষক নিয়োগ করেন।

স্কুলের ছাত্র ইউনূস পড়ার বইয়ের বাইরে অসংখ্য বই পড়তেন। ডিটেকটিভ বই ছিল তাঁর প্রিয়। কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজ, পিরামিড সিরিজ, মোহন সিরিজ হাতে পেলে তিনি সব ভুলে যেতেন। যতক্ষণ না বইটা পুরো তিনি পড়তে পারছেন ততক্ষণ তিনি মুখ তুলতেন না।

তিনি স্কুলে প্রথম, দ্বিতীয় হতে পারেননি ঠিকই, কিন্তু এস এস সি পরীক্ষায় বোর্ডে তিনি ষোলতম স্থান দখল করে প্রমাণ করেন তিনি পড়াশোনায় কত ভাল ছিলেন।

তখন থেকেই ইউনূসের চিন্তাভাবনা দেখে চিত্তপ্রসাদ তালুকদার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, সে তার নিষ্ঠা ও যোগ্যতা দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করবে। মুহাম্মদ ইউনূস যখন ম্যাগসাইসাই পুরস্কার জেতেন তখন এই প্রবীণ শিক্ষক তাঁর প্রিয় ছাত্রকে সে কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। এবার বিজয়ের সবচেয়ে বড় মুকুটটি

তাঁর মাথায় উঠলে প্রিয় ছাত্রের ব্যাপারে শিক্ষক উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন।

ইউনূসের বাবা যতটুকু সময় পেতেন ছেলেমেয়েদের খবর নিতেন, তবে বাড়ির নিয়মশৃঙ্খলার ব্যাপারটি ছিল তাঁর মা সুফিয়া খাতুনের হাতে। পুরো পরিবারের দেখভালের দায়িত্ব ছিল সুফিয়া খাতুনের ওপর। ব্যক্তিত্বময়ী, দৃঢ়চেতা তাঁর মা ছিলেন নিয়মশৃঙ্খলার ব্যাপারে খুবই কড়া। গরিব আত্মীয়রা তাঁর কাছে এসে কোনও দিন খালি হাতে ফিরে যাননি।

মা'র গান আর গল্প বলা ইউনূস খুব ভালবাসতেন। তিনি ছোটবেলায় মা'র কাছ থেকে কারবালা যুদ্ধের গল্প শুনতে চাইতেন।

মা যখন ভাল কিছু রান্না করতেন তখন মা'র পিছু পিছু ঘুরতেন ইউনূস। আর রান্না শেষ হতে না হতেই চেখে দেখার জন্যে আবদার করতেন। রান্নায় নুন, ঝাল, টক, মিষ্টি যাতে যতটুকু দরকার তা তাক মতো হয়েছে কী না সেটা ইউনূস বেশ ভাল বলতে পারতেন। তাই বাড়িতে তাঁর 'চাখিয়ে' হিসেবে বেশ নাম ছিল। মা'র হাতের রান্না ইউনূসের ছিল ভারি পছন্দের।

ভাল রান্না নয় শুধু, তাঁর মা সোনার গয়নার ওপর কারুকাজেও দক্ষ ছিলেন। দুলা মিয়াঁর দোকানের নানা গয়নার সূক্ষ্ম কাজগুলো তিনি বেশ যত্নের সঙ্গে করতেন। গয়নার কাজ করে তিনি যে টাকা পেতেন তা তিনি গরিব আত্মীয়, প্রতিবেশীর মধ্যে বিলিয়ে দিতেন।

ইউনূস তাঁর বড় বোন মমতাজের মধ্যে মায়ের অন্তত তিনটে গুণ দেখেছিলেন। চমৎকার রান্নার হাত, মানুষকে যত্ন করে খাওয়ান আর অসাধারণ গল্প বলার ক্ষমতা।

ইউনূসের এখন গল্প বলার সময় নেই। গল্পের বই পড়ারও সময় নেই। তিনি এখন মূলত দারিদ্র্য, অর্থনীতি, ক্ষুদ্রঋণ অর্থাৎ তাঁর কাজের বিষয় নিয়েই বই পড়েন। তবে ছোটবেলায় তিনি মাত্র বারো বছর বয়সে লিখে ফেলেছিলেন এক রহস্যকাহিনী।

তিনি ভালবাসতেন ছবি তুলতেও। বৃত্তির টাকা দিয়ে তিনি ক্যামেরা কিনেছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গী ছিলেন তাঁর বড় ভাই। তিনি ছবি তোলার সময়ে ছবিতে আলাদা মাত্রা যোগ করায় সচেষ্ট ছিলেন। এক সময়ে তিনি একটা ফোল্ডিং ক্যামেরা কিনে ফেললেন— যার ভিউ-ফাইন্ডারের মধ্যে দিয়ে চেনা জগৎকে নতুনভাবে দেখতে শিখলেন তাঁরা।

তিনি ছেলেবেলায় কাকার সঙ্গে হিন্দি সিনেমা, হলিউডের সিনেমা দেখতে যেতেন। আর গুনগুন করতেন হিটগানের কলি।

ছেলেবেলায় ছবি আঁকার ওপরও তাঁর বেশ ঝোঁক ছিল। এজন্যে একজন পেশাদার শিল্পীর কাছে তিনি কিছুদিন শিক্ষা নিয়েছিলেন। তবে ছবি আঁকার ব্যাপারটি তাঁর বাবা মোটেই পছন্দ করতেন না। সেজন্যে বাবাকে লুকিয়ে তাঁকে

ছবি আঁকতে হত। তবে তাঁর কাকা-কাকিমারা ছিলেন শিল্পানুরাগী। তাঁরা ইউনূসকে সাহায্য করতেন। অনুপ্রেরণা জোগাতেন। ছবি আঁকার প্রতি ঝোঁক থেকে এক সময়ে গ্রাফিক্স ও ডিজাইন সম্পর্কেও তাঁর আগ্রহ জন্মায়।

সেই আগ্রহ থেকেই তিনি হঠাৎ একদিন বসে বসে একটা কুঁড়েঘর এঁকে ফেললেন। তার চারপাশটা লাল, মাঝখানে সবুজ। যেন সেটা সবুজ জানলা। তিনি বললেন, এই কুঁড়েঘর হচ্ছে গ্রামের প্রতীক। এবার থেকে এটাই হবে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের লোগো। তিনি শুধু গ্রামীণ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা নন, তার লোগোটিও তাঁর আঁকা। গ্রাফিক্স আর ডিজাইন ভালবাসতে গিয়ে তিনি তাঁর সন্তানসম গ্রামীণ ব্যাঙ্কের লোগো এঁকে ফেললেন। সেই লোগো এখন গরিব মানুষের বুকের বল, হৃদয়ের ভাষা।

গ্রামীণ ব্যাঙ্কের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠার পরে সেই ৮০-র দশকে অনেককে নিয়েই কাজ করেছিলেন মুহাম্মদ ইউনূস। জোবরার অভিজ্ঞতা যেমন তাঁর জীবনে এক মাইল ফলক, তেমনি গ্রামীণ ব্যাঙ্কের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির পর এঁদের জীবনের কাহিনীও তাঁর কাছে এক বড় অভিজ্ঞতা। ঢাকায় গিয়ে এঁদের গল্প শুনে এসেছি। ৮০-র দশকের দারিদ্র্যের মুখ নিয়ে না লিখলে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে এই বই। যেমনটি শুনে এসেছি তেমন করেই গল্প শোনানোর চেষ্টা করেছি আমি। ৮০-র দশক মুহাম্মদ ইউনূসের গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ইতিহাসে এক মোড় এনে দিয়েছিল।

গ্রামীণ ব্যাঙ্কের এক সদস্য কুমিল্লায় স্পেনের রানি সোফিয়ার হাতে কুমিল্লার মিষ্টি তুলে দিচ্ছেন। পাশে অধ্যাপক ইউনূস।

যাঁদের গল্প শুনে এসেছি

মির্জাপুর থানা টাঙ্গাইলে। এই থানার আওতায় আজগানা ইউনিয়ন। আজগানারই একটি গ্রামের নাম বেলতোয়াল। সেই গ্রামের এক কোণে কুঁড়েঘরে সপরিবারে বাস করে জরিমন। কুঁড়েতে দুটি ঘর। একটি ঘরে কোনও ছাদ নেই। এই ছাদহীন ঘরটিতে বৃষ্টি মানেই বন্যা। সেখানে জরিমন বেঁধে রেখেছে তার গরুটিকে। গ্রামীণ ব্যাঙ্কের টাকায় কেনা তার এই গরু। অদূরে রাখা রয়েছে একটি ঢেঁকি। পাশের ঘরটি মাটির। খড় আর মাটি, গোবর দিয়ে লেপা দেওয়াল। কিন্তু সে ঘরে কোনও জানলা নেই। ফলে, ঘর অন্ধকার। ঘরটি সম্পূর্ণ আসবাবহীন। মাদুরের ওপর নোংরা কাঁথা পড়ে আছে, আর তেল চিটচিটে বালিশ।

অনতিদূরে এক বস্তা ভর্তি এক মন ধান পড়ে আছে। দড়ি টাঙানো মাথার ওপর। একটা শাড়ি ঝুলছে, পুরনো একটা শার্ট, লুঙ্গি আর ছোট ছেলেমেয়েদের কিছু পুরনো জামাকাপড় ঝুলছে দড়িতে। ঘরে জিনিসপত্র বলতে একটা মাটির কুঁজো, অ্যালুমিনিয়াম জাগ, রান্নার একটা কড়া, কয়েকটা মাটির পাত্র আর একটা প্লেট পড়ে আছে। এ-সবের পাশে একটা উনুন আর কিছু কাঠ-কুটরো। সেই জ্বালানির পাশে খেজুর গাছের শুকনো পাতা পড়ে। আর পড়ে আছে আধ-বোনা একটা মাদুর। এ নিয়েই জরিমনের সংসার। বা, বলা যায় তার বিশ্ব।

দুঃখকষ্টের মধ্যে বড় হয়েছে জরিমন। সুখ কী সে অনুভূতি তার হয়নি। তার বাবা নাজু শেখ দিনমজুর। নাজু শেখের বাবা ওমর শেখের কুড়িপারা বলে একটি জায়গায় প্রায় সাত একর জমি ছিল। নাজু শেখ বারো-তেরো বছর বয়স থেকেই ঘুরে ঘুরে বেড়াত, কোনও দায়িত্ব তেমন নিতে চাইত না। ঘুরতে ঘুরতে সে একদিন এসে পৌঁছল দৌহাট্টা গ্রামে। মির্জাপুরের দৌহাট্টা গ্রাম তার বাড়ি থেকে

মাইল পাঁচেক দূরে ছিল। সেখানে একটি মেয়েকে দেখে নাজু শেখের পছন্দ হয়ে গেল। আর বাবাকে না জানিয়ে সে তাকে বিয়ে করে ফেলল। ব্যস, তার বাবা ওমর শেখ ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করল, তার যা কিছু জায়গা-জমি সব থেকে বঞ্চিত হল নাজু শেখ।

সেই নাজু শেখের দুঃখের জীবনের শুরু। সে তার স্ত্রীকে তালাক দিল। তারপর চলে এল পলাশতলি গ্রামে। সেখানে সে আবার বিয়ে করল। তার দ্বিতীয় স্ত্রী দুই ছেলেও এক মেয়ের জন্ম দিল।

সেই মেয়েই জরিমন। ধরা যাক তার জন্ম হয়েছিল ১৯৫২-য়। ছোট থেকেই জরিমনকে অনেক কাজ করতে হত। যখন তার বন্ধুরা পুতুল নিয়ে খেলছে বা লুকোচুরি খেলছে তখন জরিমন মাঠে ছাগল চরাচ্ছে বা মা'র সঙ্গে ঢেঁকি পাড়ছে। তার বদলে সে পেটভরে খেতেও পেত না। আশপাশের লোকেরা তাকে আধ ছেঁড়া, পুরনো জামাকাপড় দিত। ছোট্ট মেয়ে জরিমনের বড় শখ ছিল দুটো কাচের চুড়ি পরে। কিন্তু যার খাওয়া জোটে না তার চুড়ি পরার কথা ভাবাও বিলাসিতা।

কোনও কোনও ইদের দিনে তাদের প্রতিবেশীরা ভাল খাবার দিত, তখন সে খেত। আবার এমন ইদও গেছে যখন তাকে উপোসি থাকতে হয়েছে। ইদে তার বড় ইচ্ছে হত শেমাই খায়! শেমাই! সে বিরাট বিলাসিতা। এই অবস্থায় তার সাত-আট বছর বয়স থেকেই বাবা-মা তার বিয়ের চেষ্টা করতে লাগল। বছর দশেক বয়সে তার বিয়ে হয়ে গেল।

সেটা ১৯৬২ সাল। দশ বছরের জরিমনের সঙ্গে বিয়ে হল বাইশ বছরের রুস্তম খানের। রুস্তম খান বেলতোয়াল গ্রামের ছেলে। বিয়ের আগেই রুস্তমের বাবা মারা যায়। তার মা দরজায় দরজায় গিয়ে ভিক্ষে করে। তার না আছে কোনও থাকার জায়গা, না খাওয়ার নিশ্চয়তা। অন্য লোকের ঢেঁকি যেখানে থাকে সেরকম একটা জায়গা বেছে রুস্তমের মা রাত কাটাত। আর রুস্তম খান পলাশতলি গ্রামে ভিকু শিকদারের বাড়ি কাজ করত। ভিকু শিকদার পলাশতলি গ্রামের সব থেকে বড় লোক মানুষ ছিল। ভিকুর ন' একর জমি ছিল। সেই সময়ে সে পনেরো টাকা মাসে মাইনে পেত। তাছাড়া ছিল থাকা-খাওয়া। ভিকু শিকদারই জরিমনের সঙ্গে রুস্তমের বিয়ের ব্যবস্থা করে। বিয়ের খরচ সবই করেছিল ভিকু। জরিমনের বাবাকে কোনও যৌতুকও দিতে হয়নি। শুধু এর পরিবর্তে রুস্তমকে দিতে হয়েছিল এক বছরের মাইনে। তার অর্থ একটাই। রুস্তমকে পরের এক বছর ভিকুর বাড়িতে বিনা মাইনেয় কাজ করতে হয়েছিল। সোজা কথায় ক্রীতদাস।

কিন্তু রুস্তমের তা বোঝার মতো বিবেচনা ছিল না। জরিমনও ভিকুর বাড়িতে গিয়ে উঠল। দশ বছরের জরিমনের চোখে তখন স্বপ্নের কাজল। সে সেখান থেকে মাঝে মাঝে বাপের বাড়ি যেত।

কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই রুস্তম টের পেল সে ভিকুর বাড়ির ক্রীতদাস—

জমিতে খাটে। আর জরিমন বাড়ির কাজের লোক। জরিমন বাড়ি পরিষ্কার করত, গোয়াল পরিষ্কার করত, বাসন মাজত। বদলে সে দু'বেলা খেতে পেত। রুস্তমকে আর তাকে দু'জনকেই ভোর থেকে রাত অবধি খাটতে হত।

এভাবে বছর দুই কাটার পর জরিমনের বাবা মারা গেল। জঙ্গলের কাছে তাদের কুঁড়ে। সেই কুঁড়েতে মা কী করে দুই ছোট ছেলেকে নিয়ে থাকবে? তখন রুস্তম আর জরিমনের ডাক পড়ল। রুস্তম তখন জরিমনদের ভিটেয় এসে থাকতে লাগল। এবার রুস্তম পলাশতলিতে রমজান শিকদারের কাছে কাজ করতে গেল। খাওয়া ছাড়া সে তিরিশ টাকা মাস মাইনে পেতে লাগল। আর জরিমন ধান থেকে চাল করার জন্যে তার মা-কে সাহায্য করত।

মায়ের কাছে এসে জরিমন দুই ছেলে, এক মেয়ের জন্ম দিল। কিন্তু সন্তান জন্মের আগে-পরে তার খাওয়া জুটত না। কোনও কোনও সময়ে সন্তানসম্ভবা জরিমনকে উপোসি থাকতে হত। তার সব থেকে ছোট সন্তান জন্মেছিল ১৯৭৪-এ। সেটা বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষের বছর। সরকার লঙ্গরখানা খুলেছিল। কিন্তু সরকারি লঙ্গরখানা সম্পর্কে এত গুজব রটেছিল যে জরিমনরা সেই লঙ্গরখানায় যায়নি। তখন নয়-দশ টাকা চালের সের। অত টাকা দাম দিয়ে চাল কেনা দুঃসাধ্য ব্যাপার। বড়জোর আটা গোলা খেয়ে জরিমনদের দিন কাটত। তার সন্তান তখন মাতৃদুগ্ধ থেকে বঞ্চিত হল। মাতৃদুগ্ধের জন্য মায়ের যে পুষ্টি দরকার তা দূরে থাক— সামান্য ভরপেট খাওয়া পর্যন্ত জুটত না।

১৯৭৪ ছিল বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষের বছর। আর ১৯৮০ ছিল বন্যার বছর। জরিমনদের বাড়ি চলে গেল জলের তলায়। তারা এক প্রতিবেশীর বাড়িতে আশ্রয় নিল। জরিমন একজনের ঢেঁকিতে কাজ শুরু করল, আর রুস্তম দিনমজুরির কাজ নিল। ঢেকিতে এক মন চাল ছাঁটলে এক সের চাল পেত। আর রুস্তমের রোজগার ছিল দিনে আট টাকা। জরিমনের মাসে দিন পনেরোর বেশি কাজ জুটত না। আর রুস্তমের এমন দিনও যেত যেদিন তার মজুরি মিলত না। দু'জনের মিলে মাসে তিনশো টাকা মতো রোজগার হত। আর তাদের খরচ লাগত খুব কম করে চারশো টাকা। সেইজন্যে মাসে তাদের বেশ কিছুদিন না খেয়ে থাকতে হত। বিশেষত জরিমন যেদিন যেদিন কাজে যেত না বা কাজ পেত না সেদিন সেদিন তাদের দুরবস্থা চরমে পৌঁছত। এক একদিন সে জঙ্গল থেকে কাঠকুটুরি কেটে আনত, জ্বালানি বিক্রি করে সে তার সন্তানদের জন্যে আটা গোলার ব্যবস্থা করে দিত।

এর আগে জরিমনের স্বামী একবার মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে কাঠের ব্যবসা শুরু করেছিল। কিন্তু এক হাজার টাকায় মাসে একশো টাকা সুদ গুনতে গিয়ে তার ব্যবসা তিন মাসে উঠে গেল। কোনও কোনও ক্ষেত্রে গ্রামে মহাজনরা এক হাজার টাকায় সপ্তাহে পঞ্চাশ টাকা সুদ নিত। একশো টাকা ধার নেওয়া মানে

মাসে ন্যূনতম দশ টাকা সুদ দিতে হত।

গ্রামীণ ব্যাঙ্ক আসায় এই সব মহাজনের মাথায় হাত পড়েছে। বাংলাদেশের গ্রামে মহাজনের সুদের কারবার অনেকটাই কমেছে।

এত অভাবের মধ্যে আবার জরিমনের স্বামী জরিমনকে মারধর করত। কোনও কোনও সময়ে রুস্তম জরিমনকে এমন মারত যে তার সারা শরীরে মারের দাগ থাকত। রক্ত পর্যন্ত ঝরত। তার মধ্যে আবার রুস্তম তালাক দেওয়ার ভয় দেখাত। ছেলেমেয়েদের মুখের দিকে তাকিয়ে জরিমন সব অত্যাচার সহ্য করত। তার তখন চিন্তা একটাই, কী করে ছেলেমেয়েদের খিদে থেকে বাঁচাব। সে সব সময়েই ভাবত একটা নতুন কোনও নিজস্ব ব্যবসা ফাঁদবে। তা হলে সে ছেলেমেয়ে নিয়ে নিজেও খেতে পাবে, কারও হুকুম বা মেজাজের দাসী হতে হবে না।

সেই সময়ে হাঁটুভাঙাতে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের একটা শাখা খোলা হল। হালিম বলে এক ব্যক্তি ছিলেন সেই শাখার ফিল্ড ম্যানেজার। হালিম সেখানকার ভূমিহীন লোকদের সঙ্গে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করতেন। জরিমন একটু দূরে দাঁড়িয়ে তাঁদের কথা শুনত। কিন্তু একা একটা মেয়ে হয়ে হালিমের সঙ্গে কী করে এগিয়ে গিয়ে কথা বলবে ভেবে পেত না। কিন্তু তার দুর্ভোগই তার মধ্যে সেই সাহস জোগাল। সে হালিমকে গিয়ে নানা প্রশ্ন করতে লাগল। হালিমের বোঝানোর পর জরিমন গ্রামে চারজনকে জোগাড় করে একটা দল গঠন করল।

বেলতোয়াল গ্রামে জরিমনই প্রথম যে একটা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক দল গড়ে তুলেছিল। তাই তখন কাজটা তার পক্ষে খুব সহজ ছিল না। সাহস নিয়ে কেউ এগিয়ে আসতে পারছিল না। জরিমনের মতো যারা 'কিছু নেই'-এর দলে সেরকম চম্পা বানু, শাফিয়া, সালেমা আর পরিচা এগিয়ে এল। কিন্তু জেল হবে, পুলিসে ধরে নিয়ে যাবে এই সব গুজব শুনে সালেমা আর পরিচা দল থেকে বেরিয়ে গেল। তখন আবার নতুন মেয়ের খোঁজ চলল। কমলা খাতুন, হামিদা বেগমকে নিয়ে নতুন দল গড়ে উঠল। ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে তাদের নানারকম প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত তাদের দল ব্যাঙ্কের কাছ থেকে স্বীকৃতি পেল।

তখনও গ্রামে ব্যাঙ্ক সম্পর্কে গুজব ছড়ানো বন্ধ হল না। কিন্তু জরিমন ছিল সাহসী। তার আর চম্পা খাতুনের উৎসাহেই ব্যাঙ্কের দল গঠন হয়ে গেল। চম্পা বানু হল দলের চেয়ারম্যান, কমলাকে করা হল সচিব। জরিমন আর চম্পাই প্রথম দু'জন যারা বেলতোয়াল গ্রাম থেকে ঋণ পেল।

জরিমন ছশো টাকা ধার চাইল। দিন পনেরোর মধ্যে সে সেই ঋণ পেয়ে গেল। জরিমন সঙ্গে সঙ্গে একটা ঢেঁকি কিনে নিল। জরিমনের স্বামী প্রতি বুধবার হাঁটুভাঙা বাজারে গিয়ে চার মন ধান কিনে আনত। আর কিছু কাঠ কিনত। সেই ধান থেকে চাল হত। চালের ব্যাপারীরা জরিমনের কাছ থেকে চাল কিনত। যদি চাল একটুও পড়ে থাকত তবে রুস্তম গিয়ে সেটা হাঁটুভাঙা হাটে বিক্রি করত। তার

সেই সময়ে তিনশো আটষট্টি টাকা মাসে লাভ হত। এ লাভ শুধু ধান বিক্রি থেকে। এবার ধান থেকে যে তুষ পাওয়া যায় তার লাভ ছিল। চার মনে আশি টাকা। স্বামী আয় করত দুশো টাকা। গ্রামীণ ব্যাঙ্কের কিস্তি দিয়ে সব মিলিয়ে তার খরচ হত চারশো বাষট্টি টাকা। সব খরচ কুলানোর পর তার বাঁচত একশো ছাব্বিশ টাকা। বছর খানেকের মধ্যে পরিশ্রম করে জরিমন সব ঋণ শোধ করে দিল। এখন আর তাদের দু'বেলা খাওয়ার ভাবনা নেই। তাদের আর শত সেলাই করা, তালি দেওয়া জামা-শাড়ি পরতে হয় না। আর উপরি পাওনা হিসেবে বন্ধ হল স্বামীর মার। রুস্তম আর যখন তখন তালাকের হুমকি দেয় না। জরিমন বুঝত এ-সবের পেছনে আছে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের কৃতিত্ব।

সে ব্যাঙ্ক সম্পর্কে সবই খুব বুঝত এমন নয়। শুধু সে জানত সে ব্যাঙ্ক থেকে যা ঋণ নেবে তার প্রতি একশো টাকায় পাঁচ টাকা সঞ্চয় করতে হবে। আর সে জানত কীভাবে, কখন ধার শোধ করতে হবে। প্রথমবার ধার শোধ, দু'বেলা পেট ভরে খাওয়া, সঞ্চয় করার পর রুস্তম আর জরিমনের মনের সব আশঙ্কা দূর হল। তারা বুঝল এই ধার থেকে তাদের জেলও হবে না, জরিমানাও না।

জরিমন এবার দু'হাজার টাকা ঋণ নিয়ে গরু কিনল। ধান-চালের ব্যবসার পাশাপাশি দুধের ব্যবসা শুরু করল। ঠিক করে নিল তার কুঁড়ে, ছেলেমেয়েদের নতুন জামাকাপড় কিনে দিল। এবার জরিমন একইসঙ্গে শুরু করল মাদুর বোনা। মাসে সে দুটো করে মাদুর বুনতে পারত। রুস্তম ক্ষেতেও কাজ করত আর তার বদলে খাবার পেত, টাকাও পেত।

সেই আশির দশকের কথা। জরিমনের মোট আয় সাতশো আঠেরো টাকা। খাওয়ার জন্যে খরচ হত চারশো পঁচিশ টাকা, সাপ্তাহিক কিস্তি আর গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সঞ্চয়ের জন্য লাগত একশো চৌষট্টি টাকা। সুতরাং প্রতি মাসে তার হাতে থাকত একশো ঊনত্রিশ টাকা।

এর সঙ্গে দলের তহবিলও রয়েছে। দলের তহবিল যত ভাল হবে, তত বড় ব্যবসা করা যাবে। তার স্বামী বলে,

— যদি গ্রামীণ ব্যাঙ্ক প্রকল্প তুলে নেয়, তখন বড় ব্যবসা ফেঁদে মুশকিলে পড়তে হবে।

— আমরা যদি ঠিকঠাক ঋণ ফেরত দিই তা হলে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক প্রকল্প গুটিয়ে নেবে না।

জরিমনের স্বামীর মন থেকে তবু ভয় যায় না। কারণ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক সঞ্চয় হিসেবে একশো টাকায় পাঁচ টাকা নিচ্ছে। তার ওপর আবার তাদের কুড়ি শতাংশ হারে সুদ দিতে হচ্ছে। গরিব লোকদের এতে সর্বনাশ হবে।

জরিমনের মনে সে ভয় নেই। তার বাড়ির জমিতে তখন ঝিঙে, কুমড়ো, চালকুমড়ো, ঢ্যাঁড়শ হচ্ছে। তাকে চাল, শাকসবজি কিনে খেতে হয় না। ইদের

সময়ে সে মাংস কিনে এনেছিল। আর অন্য একদিন ইলিশ মাছও কিনেছিল। তাদের বাড়িতে যা হয় তাই দিয়েই তাদের মোটামুটি পেট ভরে যায়। সপ্তাহে বাজার থেকে তাদের কিনতে হত:

এক ছটাক	সর্ষের তেল
এক পোয়া	কেরোসিন তেল
	নুন
কুড়িটা	পান পাতা
এক ছটাক	সুপুরি
এক পোয়া	কাঁচালঙ্কা
এক ছটাক	শুকনো লঙ্কা

আর গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ঋণ পাওয়ার পর তিনবেলা তারা ভরপেট খেত। কি খেত? সকালে নুন, শুকনো লঙ্কা দিয়ে পান্তা, দুপুরে আর রাতে চালকুমড়ো বা লালকুমড়ো, ঝিঙে বা ঢ্যাঁড়শের তরকারি আর ভাত। কোনও কোনওদিন ছেলে পুকুর থেকে ছোট মাছ ধরত। সেই দিয়ে দিব্যি খাওয়া চলত।

জরিমন কেবল গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ফিল্ড ম্যানেজার হালিমের কাছে শিখে তার নাম সই করতে পারত। কিন্তু সে চাইত না তার ছেলেমেয়েরা নিরক্ষর থাকুক। তাই সে তাদের স্কুলে পাঠাত। সে চায় তাদের জীবন যেন জরিমনের মতো না হয়।

জরিমনের জীবন সুখের। আগে তারা খেতে পেত না। অন্যের বাড়িতে ক্রীতদাস হয়ে থাকতে হয়েছে তাদের। কিংবা মাথায় কাঠকুটরোর মতো বোঝা চাপিয়ে গ্রামের এক দরজা থেকে আর এক দরজায় জ্বালানি বিক্রির জন্যে ছুটতে হত। এখন আর তাকে বাড়ি বাড়ি ঘুরতে হয় না। খেতে পাওয়াটা তার কাছে আর সমস্যার নয়। বাড়িতে এখন সে একটা ঘর তুলেছে। বাড়িতে বাসনপত্র বলতে কিছুই ছিল না। বাটি, গ্লাস, রান্নার কড়া, জলের জাগ— এ সবই সে কিনেছে।

জরিমন যখন তার বাড়ির বাসন কেনার গল্প করছিল তখন তার স্বামী পাঁচ টাকা দিয়ে এতবড় একটা কাঁঠাল কিনে বাড়ি ঢুকল। জরিমনের মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কাঁঠালের মতো মধুর ফল খাওয়ার লোভে নয়, তার নতুন জীবনের জন্য তার মুখ আজ উদ্ভাসিত। একদিন তার টিনের বাড়ি হবে। আর সঙ্গে থাকবে এক চিলতে জমি। এখন তার বাড়িতে সবজি হয়। তখন সেখানে হবে ছোট্ট বাগান। রোদে ঝলমল করে হেসে উঠবে রঙিন ফুল।

গ্রামীণ ব্যাঙ্কের দরিদ্র সদস্যদের সঙ্গে।

যাঁদের গল্প শুনে এসেছি

ভুয়াপুর সদর থেকে খারোক গ্রামের দূরত্ব মোটে তিন মাইল। কিন্তু ভুয়াপুর থানার প্রাণকেন্দ্র থেকে এই গ্রাম প্রায় বিচ্ছিন্ন। ভুয়াপুর থানা টাঙ্গাইল জেলায়। রাস্তার হাল এত খারাপ যে খারোক গ্রামটিকে বিচ্ছিন্ন বললে ভুল বলা হয় না। বেশ কয়েকটা বাঁশের নড়বড়ে সেতু ডিঙিয়ে তবে খারোক গ্রামে পৌঁছতে হয়। খারোক গ্রামে এলে মনে হয় না আমরা আধুনিক একটা সময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছি। খারোক গ্রামের নিকলা নোয়াপাড়ায় সাকিনা বিবি থাকত। সাকিনার স্বামী বহুদিন আগে মারা গেছে। সে গ্রামের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে নানারকম কাজ করে দিয়ে আসত।

সাকিনা বিবির বাড়ি পৌঁছনো মানে রীতিমতো অ্যাডভেঞ্চার করা। কোথাও হাঁটুজল, কোথাও কোমর সমান জল। নৌকা করে খাল-বিল পেরিয়ে তার বাড়ি যেতে হত। খারোক গ্রামের চারপাশে এত খালবিল যে এটাকে একটা দ্বীপই বলা যেতে পারে। এ গ্রামে দু-চার ঘরের কিছুটা পয়সা আছে। বাকিদের দারিদ্র্য গ্রাস করেছে। সাকিনার বাড়িটা একটু অন্যরকম। চারদিকে এত বাঁশঝাড়ের মধ্যে তাদের বাড়ি যে মনে হয় যেন সেখানে মানুষের বসতি নেই। বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল এক বিশাল কাঁঠাল গাছ। সেই গাছগাছালির মধ্যে সাকিনা বিবির বাড়িটাকে মনে হত যেন একটা ছোট্ট পাখির বাসা। কোনওরকমে বাঁশের খুঁটি দিয়ে বাড়িটিকে দাঁড় করিয়ে রাখা। একটু যদি জোরে বাতাস দেয় তবে যে-কোনও সময়ে বাড়িটা মুখ থুবড়ে পড়বে। খড় দিয়ে ছাওয়া। বৃষ্টিতে জল থইথই। তখন সাকিনা বিবি তার দুই সন্তান নিয়ে প্রতিবেশীর দালানে বা রান্নাঘরে আশ্রয় নিত।

তার একটাই শাড়ি। বৃষ্টি-ঝড়ে ভিজে গেলে তাকে ওই শাড়ি পরেই কাটাতে হয়।

ছোটবেলা থেকেই সাকিনাকে ওইরকম ভিজে জামাকাপড়ে কাটাতে হত। কারণ, তার বাবারও তাকে খেতে পরতে দেওয়ার মতো সংস্থান ছিল না। সে যেন ছিল তার বাবা-মায়ের অবাঞ্ছিত সন্তান। মায়ের যত্ন কাকে বলে তা সাকিনা জানত না। সাকিনারা ছিল পাঁচ ভাইবোন। সে কোনওদিন স্কুলের মুখ দেখেনি। তবে মাদ্রাসায় পড়েছিল কিছুদিন। সে শিক্ষাও ছিল এত অল্প সময়ের যে সে একজন সাক্ষর মানুষও হয়ে উঠতে পারেনি। এমনিতেই তাদের সংসারে অভাব অনটন ছিল, তার বাবার মৃত্যু সেই অভাবকে বাড়িয়ে দিয়েছিল বহুগুণ। সাকিনা তখন অন্য ভাইবোনদের থেকে বড়। সে বুঝল তারা আরও অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে। সাকিনা মাঠে গরু-ছাগল চরাতে শুরু করল। বাকি সময়ে কাঠকুটুরির জোগান দিত। সাকিনার মা অন্যের বাড়িতে চাল সেদ্ধ করার কাজ পেয়েছিল।

সাকিনারা গরিব হলেও তার ছিল ভরা স্বাস্থ্য। সে জন্যে সাকিনার বড় দিদির বিয়ের পরই তার মা সাকিনার বিয়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সাকিনার মায়ের একজোড়া বালা ছিল। তাই দিয়ে তার দিদির বিয়ের খরচ জোগানো হয়েছিল। সাকিনার জন্যে বা বাড়ির কারও জন্যে তখন আর কোনও কিছু পড়ে ছিল না।

সাকিনার যখন বারো বছর বয়স তখন তাদেরই এক প্রতিবেশী একটি ছেলের খোঁজ দিল। বিয়েতে সাকিনার কোনও আগ্রহ ছিল না। কিন্তু চোখের জল কোনও প্রাচীর হয়ে দাঁড়াল না। তার মা বিয়েতে কিছু দিল না। তার শ্বশুরবাড়ি থেকে সে একটামাত্র শাড়ি পেয়েছিল। সেই দিয়েই তার বিয়ে হয়ে গেল।

বিয়ের পর খারোক গ্রামে এসে সে বুঝল তার শ্বশুরবাড়ি সম্পর্কে তাকে যা বলা হয়েছে সবই মিথ্যে। তার স্বামী আফাজ আলি একা মানুষ। আফাজ আলির বাবা-মা নেই। কোনও জমিজমা নেই। বিয়ের ক'দিন বাদেই আফাজ আলি অন্যের জমি চাষে চলে গেল। এই মিথ্যে আর বঞ্চনা একজন বারো বছরের বালিকার পক্ষে সহ্য করা দুরূহ।

যখন স্বামীর আনা সামান্য টাকায় তাদের খাবার জুটত না তখন বারো বছরের বালিকাটি যেন কয়েক রাতের মধ্যে বড় হয়ে গেল। সে অন্যের বাড়ি চাল সিদ্ধ থেকে শুরু করে, ঘর নিকনো, গোয়াল পরিষ্কার, বাসন মাজার মতো বাড়ির কাজ করে কিছুটা আয় শুরু করল। এত কিছু করেও সে স্বামীর মন পেত না।

একদিনের কথা তার বেশ মনে আছে। সেদিন তার স্বামী আফাজ আলির সঙ্গে তার কথা কাটাকাটি হয়েছে। আফাজ আলি একটা কাঠের চ্যালা দিয়ে তাকে মারধর করতে আরম্ভ করল। প্রায় গলা টিপে ধরছিল। ততক্ষণে তার মাথা ফেটে গেছে। এরপর সে অজ্ঞান হয়ে গেল। তিনদিন সে একটানা বিছানায় শুয়েছিল। কিন্তু তার স্বামী তাকে একবারও জিজ্ঞেস করেনি, সে কেমন আছে। কোনও ওষুধ

দেওয়ারও চেষ্টা করেনি। দিন চারেক পর সে কোনও ভাবে তার মা'র কাছে খবর পাঠাল।

তার মা সাকিনাকে সিঙ্গুরিয়া গ্রামে নিয়ে এল। নিয়ে গেল বটে, কিন্তু তার মা বোঝাল, তার যখন বিয়ে হয়ে গেছে, সে বিয়ে ভাল হোক বা মন্দ হোক সেটাই তার আপন ঘর। সাকিনা চোখের জলে মা'র কাছে সিঙ্গুরিয়ায় থাকার অনুমতি চাইল। কিন্তু মা'র মন তাতে গলল না। সাকিনা বুঝল, সিঙ্গুরিয়ার দরজা নয়, তার মা'র দরজা তার কাছে চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে।

সিঙ্গুরিয়া তার বাড়ি নয়, খারোকেও তার স্থান নেই। কিন্তু সেই খারোকেই সাকিনা ফিরে গেল। তার সন্তান হচ্ছিল না বলে তার ওপর আফাজ আলি আরও অসন্তুষ্ট হল। কিন্তু বিয়ের আট বছর পর তার প্রথম সন্তান হল। সে মেয়ের নাম রাখল আকতারি বেগম। কিন্তু আকতারি বেগম ছোট থেকেই অসুস্থ ছিল। সে মারাও গেল। তার আগেই সাকিনার একটি পুত্রসন্তান হয়েছে। তার নাম শাহিনূর। শাহিনূরের পাঁচ বছর বয়সে জন্মায় ডলিমন। তারা দু'জনই অসুস্থ ছিল। কিন্তু টাকার অভাবে তাদের চিকিৎসা করানো যেত না।

তাদের খাবারও ঠিকঠাক জুটত না বলে সাকিনা এর ওর বাড়ি থেকে গরু বা ছাগলের দুধ চেয়ে এনে খাওয়াত। এ-সবের মধ্যে আফাজের কাশি আর হাঁপানির টান দেখা দিল। বিয়ের আগে সাকিনার মাকে বলা হয়েছিল আফাজের জমি আছে, সম্পত্তি আছে, কিন্তু বিয়ের পর সাকিনা বুঝতে পারল তার স্বামী অন্যের জমিতে মজুর খাটে। সাকিনা তখন এর ওর বাড়িতে কাজ করে ঘরে একটু আধটু টাকা আনত। কিন্তু যখন আফাজ অসুস্থ হয়ে পড়ল তখন দিনমজুরির টাকাও বন্ধ হয়ে গেল। সে যে হাঁপানির রোগী এটাও বিয়ের আগে গোপন রাখা হয়েছিল। রাতে যখন টান উঠত তখন আফাজের গলা দিয়ে ঘড়ঘড় আওয়াজ বেরোত, বুক দিয়ে শোঁ শোঁ শব্দ হত। আফাজ রাতে ঘুমতে পারত না। সাকিনাও সারা রাত জেগে স্বামীর সেবা করত। সে তখন ভুলেই গিয়েছিল এই স্বামী তাকে কীভাবে মারধর করেছে। আফাজ আলি কার্যত পঙ্গু হয়ে গেল। তখন সাকিনার হাতে কোনও টাকা নেই। ডাক্তার ডাকা যায়নি, পড়েনি একফোঁটা ওষুধ। আফাজ আলি যখন মারা যায় তখন তার হাতে এমন পয়সা ছিল না যে স্বামীর মৃত্যুর পর তার শেষ কাজ করে।

প্রতিবেশীরা তাকে সাহস জোগাত। কিন্তু সেই সাহস জোগানোর পেছনে ছিল না কোনও ভরসার কথা। বাড়িতে খাবার নেই, এতদিন ধরে নিদ্রাহীন রাত কাটিয়ে সে যেন আর পারছে না, তার মধ্যে স্বামীর মৃত্যু, সাকিনা অসুস্থ হয়ে পড়ল। এতদিন তার দুঃখের জন্য সে স্বামীকে দায়ী করত কারণ আফাজ তথ্য গোপন করে, মিথ্যে বলে তাকে বিয়ে করেছে। কিন্তু এখন স্বামীর মৃত্যুতে সে দুঃখী। স্বজন হারানোর দুঃখে, সঙ্গী হারানোর শোকে সে চোখের জল ফেলতে

লাগল।

স্বামীর মৃত্যুর পাঁচদিন পর সে উঠল। উঠে পাশের বাড়ি থেকে খাবার চাইল। তার অবস্থা দেখে অন্যেরা সাহায্যের জন্য এগিয়ে এল। কিন্তু কতদিনের জন্য? সাকিনা অন্যের বাড়িতে কাজ করে কিছু খেতে পেত।

এই সময়ে সে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের কথা জানতে পারল। সে যখন গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ঋণ নেয় তখন সাকিনার থাকার কোনও জায়গা নেই। কারও বাড়িতে সে তার সামান্য, তুচ্ছ জিনিসগুলো রাখত, আর সে নিজে অন্য কারও বাড়িতে থাকত।

যাদের বাড়িতে কাজ করত তারা তাকে খেতেও দিত। কিন্তু ধান কাটার পর গ্রামে তত কাজ পাওয়া যেত না। তখন সে সন্তান নিয়ে দারিদ্র্যের মধ্যে আরও ডুবে গেল। এর অর্থ একটাই— উপোস, না-খাওয়া। সাকিনা এবার গ্রামের দরজায় দরজায় ভিক্ষাপাত্র নিয়ে দাঁড়াল। তাতেও বিশেষ কিছু আসত না। বর্ষায় ভিক্ষে করা এবং পাওয়া দুটোই মুশকিলের। না-খাওয়া অবস্থা ছিল সাকিনাদের নিত্যসঙ্গী। পুকুর থেকে তুলে এটা ওটা খেত। মাঝে মাঝে সে কচুসেদ্ধ খাওয়াত তার সন্তানদের আর পাড়া প্রতিবেশীর কাছ থেকে ভাতের ফ্যান চেয়ে নিয়ে এসে খেত।

কিন্তু ১৯৭৪-এ যখন বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল তখন ফ্যানও অমিল। যারা ফ্যান দিত তারা ভাতের সঙ্গে ফ্যানও খেতে শুরু করে দিল। এই সময়ে তার একমাত্র শাড়িটি এমন ছেঁড়া অবস্থায় ছিল যে তাতে তার লজ্জা নিবারণ হওয়াও বেশ কঠিন হয়ে পড়েছিল। এত কষ্টেও তার স্বাস্থ্যের ডৌল খারাপ হয়ে গেলেও একেবারে চলে যায়নি। সেই লজ্জার দিনের কথা সাকিনা মনে রাখতেও চায় না।

তারপর যে বছর বন্যা এল, সে বছর সাকিনা ভিক্ষে করতেও বেরতে পারত না। সবকিছু চলে গেছে জলের তলায়। অসহায় সাকিনা দুই সন্তানকে নিয়ে উপোসি থাকছিল। ততদিনে তার মেয়ে আকতারি মারা গেছে। বন্যার সময়টা তার কাছে কিছুটা সহনীয় হয়েছিল কারণ সে সরকারের কাছ থেকে তিরিশ সের আটা পেয়েছিল!

কিন্তু সে আর ক'দিন? সাকিনার না-খেতে-পাওয়া অবস্থার যেন আর শেষ নেই। সে জানত গ্রামে মহাজনরা সুদের কারবার করে। কিন্তু সে এত গরিব, সে ওই সব সুদের মধ্যে যায় কী করে! তাদের কাছ থেকে একশো টাকা ধার নিলে মাসে দশ টাকা করে কেবল সুদই গুনতে হবে। এক মন ধান ধার নিলে তিন মাস বাদে ফেরত দিতে হবে তিন মন ধান! তাদের পাড়ার একজনকে মহাজনের সুদের হাত থেকে বাঁচতে সব জমি খোয়াতে হয়েছিল। সাকিনা বড় ভয়ে এই মহাজনীদের থেকে দূরে থাকত। তার অর্থ একটাই, তাকে ভিক্ষে করে বেড়াতে হবে। ভিক্ষে করাও সহজ ছিল না। কেউ কেউ ওকে ভিক্ষে না দিয়ে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিত। কারও কারও বাড়িতে আবার 'পরে এস' বলে সরিয়ে দিত। সাকিনারও উপায়

ছিল না। সে 'পরে' যেত। বার পাঁচ-সাত যাওয়ার পর হয়ত ভিক্ষে জুটত, কোথাও বা তার বদলে জুটত গালমন্দ।

এমন সময়ে বীরহাটিতে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিরা গিয়ে ভূমিহীন, গরিবদের মধ্যে ঋণ দেবেন বলে ঘোষণা করলেন। ওই গ্রামের রহিমা সাকিনাকে সে খবরটা দিয়েছিল। রহিমা তাকে বলেছিল,

— তোমার এত কষ্ট, তুমি গ্রামীণ ব্যাঙ্কের থেকে ঋণ নিচ্ছ না কেন?

— আমাকে কেউ এক মুঠো চাল দিতে চায় না, কে আমাকে ঋণ দেবে?

সে গ্রামের লোকের পরামর্শ নিতে গেল। কেউ বলে ঋণ নিলে ভাল হবে, কেউ বা বলে, 'কী দরকার, তুমি বরং আমাদের বাড়িতে কাজ কর।'

সাকিনার মতো অতটা অসহায় না হলেও যারা গরিব তারা বলল, 'ধার নাও তো, তা দিয়ে তুমি প্রথমে নিজে বাঁচো আর সন্তানদের বাঁচাও। তারপর সমস্যা এলে তখন দেখা যাবে।'

তাতেও মন সায় দেয় না সাকিনার। সে চলল সিঙ্গুরিয়ায়। তার মা, বোন একেবারে সোজা 'না' বলে দিল। কিন্তু ভাই একটু একটু সাহস দিল। 'ভয় পাস না, ধার নিয়ে নে।' সাকিনার মনে একটাই ভয়, যদি সে ধার শোধ দিতে না পারে তবে কী হবে? ধার নেওয়ার জন্যে তার মন চঞ্চল। মন বলে এই ধারই পাল্টে দেবে তার জীবনধারা। আবার কে যেন তাকে বেঁধে রাখে। কোনও এক অজানা ভয়।

সাকিনার অনিশ্চয়তা সাকিনাকে দু'দিন রাত জাগিয়ে রাখল। তারপর সে ঠিক করল সে ঋণ নেবে। কিন্তু অন্যরা তাকে সদস্য হতে বাধা দিল। 'সে কী করে ঋণ শোধ দেবে?' এই অবস্থায় সাকিনার সদস্য হওয়াই আটকে যায়। কোনও দলই তাকে নিতে রাজি হয় না। তখন সে একজন ব্যাঙ্ককর্মীর সঙ্গে কথা বলল। সালেহা। সালেহা, সাকিনার হয়ে অন্যদের সঙ্গে কথা বলল। সাকিনা বারবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিল, সে যথাসময়ে ঋণ শোধ করবে। শেষ পর্যন্ত খারোক নিকলা মহিলা সমিতির সদস্য হল সে।

এই প্রথম সে ভাবল সে একটা বড় কিছু করে ফেলেছে। তার এত বছরের জীবনে প্রথম আনন্দের রেশ— প্রতিকূলতা কাটিয়ে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সদস্য হওয়া। সে যখন পেন দিয়ে তার নাম সই করতে গেল তার হাত থরথর করে কাঁপছিল। সে শিখে নিল নাম সই করা।

ভুয়াপুরে গিয়ে সে আটশো টাকা পেল। এই প্রথম তার জীবনে অতগুলো টাকা দেখা। সে প্রথমে গরু কিনতে চেয়েছিল। কিন্তু সে সময়ে খুব গরু-ছাগল মরে যাচ্ছিল বলে ম্যানেজার তাকে গরু কিনতে বারণ করলেন।

— তুমি গরু কিনো না, কোনওভাবে গরু যদি মরে যায় তা হলে তুমি বিপদে পড়বে।

তখন ঠিক হল সে জামাকাপড় কিনে ফিরি করবে। তবুও মন থেকে আশঙ্কার

মেঘ আর সরতে চায় না। 'কী হবে যদি আমি টাকা হারিয়ে ফেলি!' এরকম অদ্ভুত প্রশ্নে সে নিজেকে নিজে জর্জরিত করে ফেলল। তাকে দেখে রহিমা বলল,

— 'তোমার ভয় করছে?'

— 'এত টাকা!'

সাকিনা রহিমাকে সঙ্গে নিয়ে এল। ভুয়াপুর থেকে খারোক— এই পর্যন্ত রহিমাই সাকিনার টাকা সঙ্গে করে নিয়ে এল।

এরপর সে শার্ট, অন্য পোশাক, সোয়েটার সব কিনল। সেই সঙ্গে কিনল পাঁচ সের চানাচুর, মুসুর ডাল, পনেরো সের রাঙালু। এ-সব কেনার পর তার হাতে একচল্লিশ টাকা রয়ে গেল। তারপর সে এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি, এ পাড়া থেকে ও পাড়া, এ গ্রাম থেকে সে গ্রাম সেই সব জিনিস ফিরি করতে লাগল।

সে একটা বুদ্ধি আঁটল। রাঙালু সেদ্ধ করে সে বেচতে আরম্ভ করল— ওজনে নয়, গুনতি হিসেবে। তাতে তার জিনিসের দাম অনেকটা উঠল। বদলে সে নিল আটা, চাল। আর পেল অল্প কিছু টাকা।

প্রথম দিন মাথায় ঝুড়ি করে সে তার জিনিস ফিরি করেছিল। প্রথম দিনের বিক্রি থেকে সে মোট পেয়েছিল পঞ্চাশ টাকা, পাঁচ সের গম, আড়াই সের চাল, তিন সের মুসুর ডাল। এত সব পেয়ে তার মনেই হচ্ছিল না সে সারাদিন ঘুরে ঘুরে হেঁটে হেঁটে ফিরি করে বেরিয়েছে। সে প্রতি সের দশ টাকা হিসেবে চানাচুর বেচেছিল। তাতে তার লাভ ছিল বারো টাকা। তার সব থেকে বেশি লাভ হত রাঙালু থেকে।

সাকিনা প্রথমেই তার আর সন্তানদের জন্যে খাবার আর জামাকাপড় কিনল। তাই বলে সবজি কিনল না। বাংলাদেশে সর্বত্র কচু পাওয়া যায়। তা হলে ভয় কি? কচু আর গরম ভাত। দিব্যি তাদের খাওয়া হয়ে গেল। উপোসি মুখে কচুর আস্বাদ যে কত ভাল তা বোঝা যায়! চাল, সামান্য তেল, নুন আর লঙ্কা কিনেই তার বাজার শেষ। সেই দিয়ে পেট ভরে ভাত খাওয়া যায়।

সে দু'বার দু'কিস্তি ঋণও পরিশোধ করল। ভিখিরি যে ছিল একদিন সেই সময়মতো ঋণ শোধ করে।

এর মধ্যে বর্ষা এসে গেল। এই সময়টাই বড় ভয়ের। বড় বিচ্ছিরি। জিনিস কেনা কষ্ট, কষ্ট ফিরি করা। এমন বর্ষা হল এক সপ্তাহ যে সে বেরোতে পারল না। মূলধন থেকে কিস্তি ফেরত দিল।

গ্রামীণ ব্যাঙ্কের দৌলতে সে দু'মন মুসুর ডাল, দেড় মন ধান কিনে তার প্রতিবেশীর ঘরে মজুত রেখেছিল। সে নিজের জন্যে শাড়ি আর সন্তানদের জন্যে জামাকাপড় কিনে দিল। তারপর তার কুঁড়েঘরটি সারিয়ে নিল। তার ছেলে একবার অসুস্থ হয়ে পড়ল। তখন সে কুড়ি টাকা খরচ করে ওষুধ কিনেছিল। সে চায়নি তার মতো ভাগ্য হোক তার সন্তানদেরও। তাই এবার সে তাদের স্কুলে নিয়ে

গেল। পাঁচ টাকা খরচ করে বইখাতা কিনল।

সেই সময়ে তারা মাছ-মাংস খেত না। সন্তানরা মাছ-মাংস কেনার কথা বললে সে বলত, 'আর একটু অপেক্ষা কর। তারপর আমি তোমাদের পছন্দমতো সব খাওয়াব।' কিন্তু একদিন তারা মা'কে বাধ্য করল একটা কাঁঠাল কিনতে। শাহিনূর অনেকদিন মাছ ধরেনি, সে মাছ ধরলে তবে মাছ খাওয়া হয়!

তবে মাছ না খায় না খাক বেচারারা, ভিক্ষের চাল তো খেতে হয় না। সাকিনা তারপর থেকে কোনওদিনই আর ভিক্ষায় বেরোয়নি। ভিখিরি থেকে ছোট ব্যবসায়ী হওয়ার এই হল ইতিবৃত্ত।

রক্তগোলাপে মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন

কী করে প্রসার

বিনা আমানতে গরিব মানুষকে বিশেষ করে দুঃখী নারীর হাতে, তার রোজগারের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ তুলে দেওয়ার যে সহজ পদ্ধতি তাকে ইউনূস মডেল বলা যায়। তাতে গরিবের ভাগ্য বদলে যাচ্ছে। তাঁর সহজ এই মডেলটি বাংলাদেশের হাজার কয়েক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গ্রহণ করেছে এবং সবাই মিলে দেড় কোটির মতো পরিবারকে তারা এই পদ্ধতিতে ঋণ দিয়েছে। একমাত্র গ্রামীণ ব্যাঙ্কই ছেষট্টি লক্ষ গরিব পরিবারকে ক্ষুদ্র ঋণ দিয়েছে। তার মধ্যে তেষট্টি লক্ষ মহিলা। স্বেচ্ছাসেবীদের দেওয়া ঋণের কথা হিসেবে আনলে ক্ষুদ্র ঋণীদের সংখ্যা দেড় কোটি ছাড়িয়ে যাবে।

মুহাম্মদ ইউনূসকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি যে কাজ করেছেন তা অর্থনীতির। তিনি অর্থনীতিতে নোবেল পেলে বেশি খুশি হতেন? তিনি বলেছিলেন, যখন পদার্থবিদ্যায় কেউ নোবেল পুরস্কার পান তা কেন তিনি পেলেন পদার্থবিদরা ছাড়া বোঝেন না কেউ, যখন রসায়নে কেউ নোবেল পান তা-ও রসায়নশাস্ত্রের বিজ্ঞানীরা ছাড়া আর কেউ ঠিক বুঝতে পারেন না, অর্থনীতির ক্ষেত্রেও একই কথা— সে তত্ত্ব কেবল অর্থনীতিবিদ আর অর্থনীতির ছাত্ররা বোঝেন। কিন্তু শান্তিতে নোবেল পেলে বোঝেন সবাই। এটা এমন একটা জিনিস যা পৃথিবীতে সবার দরকার। বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা কাটিয়ে শান্তি দরকার আর গরিবের কাজে লাগে বলে ক্ষুদ্র ঋণ দরকার। বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ঋণের বাড়বাড়ন্ত। একমাত্র গ্রামীণ ব্যাঙ্কই যে পরিমাণ ঋণ গ্রামের গরিব মানুষকে দেয়,

দেশের অন্য সব সরকারি, বেসরকারি ব্যাঙ্ক মিলে ঋণ দেয় প্রায় তার কাছাকাছি পরিমাণ। গরিবের শ্রম এবং উদ্যোগে সেই আর্থিক সম্পদ ব্যবহৃত হচ্ছে। ক্ষুদ্র ঋণ পেয়ে কত নারীর শুধু অভাব ঘুচেছে তাই নয়, সম্মান বেড়েছে। প্রতিদিন এঁদের সংখ্যা বাড়ছে।

সারা বিশ্বের প্রায় একশোটি দেশে এই ক্ষুদ্র ঋণের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। যেখানে যেখানে এই মডেল চালু হয়েছে সেখানেই তার জয় জয়কার।

যে কেউ প্রশ্ন করতে পারেন বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ঋণের এই ব্যাপক প্রসার ঘটল কেন? এর পেছনের আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতটাই বা কেমন ছিল? বাংলাদেশের বিশিষ্টজন আতিউর রহমান বলেছেন, বাংলাদেশের অর্ধেক পরিবারই হয় ভূমিহীন অথবা প্রায় ভূমিহীন। কুড়ি শতাংশের কোনও চাষের জমি নেই। একত্রিশ শতাংশের চাষের জমি আধ একরেরও কম। সবুজ বিপ্লবের কারণে কৃষিমজুরের চাহিদা বাড়ছে, কিন্তু তা সব শ্রমজীবী মানুষকে কাজ দেওয়ার জন্যে যথেষ্ট নয়। ধনীরা আবার নির্দিষ্ট খাজনায় জমি বর্গায় চাষ করাতে বেশি উৎসাহী। কৃষিখাতে শ্রমবাজার তাই সীমিত থেকে গেছে। কৃষিমজুর নিয়োগের যে সুযোগ বাড়ছে তাতে পরিবারের অর্ধবেকারদেরই কাজে লাগানো হচ্ছে। তাই ভূমিহীনদের নিজস্ব কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। গ্রামে উদ্বৃত্ত তৈরি হচ্ছে। আর অর্থ আসছে বিদেশে নিয়োজিত এবং পোশাক শিল্পে নিয়োজিত কর্মীদের কাছ থেকে। এই অর্থ গ্রামে অ-কৃষিকাজের চাহিদা বৃদ্ধি করছে। ছোটখাট ব্যবসা, ভ্যান বা রিকশা চালানো— এ-সবের চাহিদা বেড়েছে। এ-সব কারণে গ্রামীণ আয়ও বাড়ছে। ফলে দুধ, মাছ, মাংস, মুরগি পালন, পরিবহণ, ছোটখাট শিল্পের চাহিদা বেড়েছে। ছোটখাট শিল্প বলতে ট্র্যাক্টরের পার্টস, বিদ্যুৎ মেরামতির জিনিসপত্র, চালের কল এই সব। গ্রামের ধনী উদ্যোক্তারা এত ছোটখাট চাহিদা মেটাতে এগিয়ে আসে না। গরিবরাই এই সব করে নিজেদের সংস্থান করে। চলতি মূলধন নেই বলে গরিবরা এ কাজ নিজেরা করতে পারে না। মহাজনের কাছে গেলে বিরাট অঙ্কের সুদ চায়। মহাজনের কাছ থেকে মূলধন নিলে তাদের উদ্যোগের মুনাফা কমে যায়। বাজার মূল্যেও এদের পুঁজি দেওয়া গেলে তারা তাদের উদ্যোগের দৌলতে স্থানীয় চাহিদা মেটানোর চেষ্টা করতে পারে এবং নিজেদের দারিদ্র্য ঘোচাতে পারে। প্রচলিত ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা এদের ঋণ দিতে আগ্রহী নয়। এরা আমানত দিতে পারে না। গ্যারান্টি হিসেবে কিছুই রাখতে পারে না। প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ নিতে হলে অনেক কাগজপত্র পূরণ করতে হয়। গ্রামের অশিক্ষিত, কোনও কোনও ক্ষেত্রে নিরক্ষর মানুষের পক্ষে তা প্রায় অসম্ভব। দালাল ও ব্যাঙ্ক কর্মকর্তারা শুরুতেই ঋণের একটা বড় অংশ মেরে দেয়। বাদবাকি টাকা দিয়ে তাদের পক্ষে সুদ দিয়ে লাভ করা সম্ভব হয় না। আর ব্যাঙ্কগুলি বড় ঋণ দিতেই বেশি আগ্রহী। অনেকজনের সঙ্গে তা হলে কাজ করতে হয় না। অনেক হিসেবও

রাখতে হয় না। এমনই এক পরিস্থিতিতে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সৃষ্টি। গরিবকে যথাযথ মূল্যে ছোটখাট কাজে ঋণ দেওয়ার নয়া এক প্রতিষ্ঠানের যাত্রা এভাবেই শুরু হয়েছিল গত শতাব্দীর সত্তরের দশকে। নিঃসন্দেহে এটি ছিল সৃজনশীল মানবিক উদ্যোগ।

যে নারীর সামাজিক মর্যাদা ছিল না, যাকে সুযোগ পেলে পরিবার, সমাজ তুচ্ছ ও অপমান করত, স্বামী যার ওপর কথায় কথায় নির্দয় হত, মারধর করত, যার শ্রমের কোনও সামাজিক ও বাণিজ্যিক স্বীকৃতি ছিল না, যাকে প্রায়ই অভুক্ত থাকতে হত— সেই সব দুঃখী নারীকে রোজগারের পথ তৈরি করে দিয়ে ড. ইউনূস তাঁদের মনে বল-ভরসা দিয়েছেন।

অর্থনীতি নিয়ে লেখালেখির চেয়ে তিনি মাঠে কাজ করেছেন বেশি। কাজ করে করেই লক্ষ লক্ষ গরিবের জীবনে চলার ধরনটাই তিনি পাল্টে দিয়েছেন।

এই পাল্টে দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি ভিক্ষার পথে যাননি। কারণ, দারিদ্র্যমুক্তিতে সেটা কোনও স্থায়ী সমাধান নয়। তিনি বিশ্বাস করেন, ভিক্ষা বা ত্রাণ দিয়ে দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব নয়। এর ফলে মানুষের উদ্যোগ কমে যায়। মানুষের মধ্যে যে বিপুল সম্ভাবনা ও সৃজনশীলতা রয়েছে তার উন্মেষ ঘটানোই যথার্থ কাজ।

গরিবের সক্ষমতার সঙ্গে অন্যদের সক্ষমতার ফারাক বিশেষ নেই। গরিবের সুযোগ নেই। অন্যদের তা আছে। গরিবের জন্যে সুযোগ সৃষ্টি করে দিলে তারাও অসাধারণ সাফল্য অর্জন করতে পারে। এ কথা প্রমাণিত। তারাও উদ্যোগী। কিন্তু সুযোগের অভাবে তা বাস্তবে রূপায়িত হয় না।

তবে এ জন্যে চাই সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়মনীতি। সদস্যদের মতামত নিয়ে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক সেই সব নীতি চালু করেছে। প্রচলিত ব্যাঙ্কিং নিয়মনীতির সঙ্গে এর মিল নেই। প্রচলিত ব্যাঙ্ক তেলা মাথায় তেল ঢালে। গ্রামীণ ব্যাঙ্ক যার কিছু নেই তাকে ঋণ দেয়। এই গরিব সদস্যরাই ব্যাঙ্কের আসল মালিক। তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা (গরিব মহিলা) পরিচালনা পর্ষদে বসে ব্যাঙ্কের নিয়মনীতি অনুমোদন করেন। তাদের প্রত্যেকের হাতে ব্যাঙ্কের মালিকানার শেয়ার আছে। গরিব মানুষ ঋণ নিয়ে তা সময়মতো ফেরত দেয়। এ কথাটি ড. ইউনূস বিশ্বাস করেন। আর তাঁর বিশ্বাস সত্য প্রমাণিত বলেই গ্রামীণ ব্যাঙ্ক আজ এত সফল। তাদের আগে কেউ ঋণ দেয়নি। তাই ঋণ পেলে তারা তাদের প্রতি বিশ্বাসের অবমাননা করতে চান না। দুর্যোগে পড়লে তাদের টাকা ফেরত দিতে খানিকটা দেরি হতে পারে। কিন্তু টাকা ঠিকই ফেরত দেবে। গরিবের মধ্যে নারীর অবস্থান তুলনামূলকভাবে খারাপ। অথচ তারাই সংসারের উন্নতি করেন, সন্তানদের ভাল খাওয়ানো, পরানোর জন্য তাদের দুশ্চিন্তার শেষ নেই। তাদের দূরদৃষ্টি বেশি। আর সে কারণেই গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ছিয়ানব্বই শতাংশ মহিলা। এটা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের বৈশিষ্ট্য।

গ্রামীণ ব্যাঙ্ক বিশ্বাস করে, গরিবের ঋণ পাওয়ার অধিকার মানবাধিকারের

মতোই তার প্রাপ্য। এই ঋণ বিশ্বাসের ওপর দেওয়া। এই ঋণের মূল লক্ষ্য স্বনিয়োজনের মাধ্যমে আয়-রোজগার বৃদ্ধি করা। ভোগের জন্যে নয়, বিনিয়োগ বৃদ্ধি করাই তার লক্ষ্য। গ্রুপ ও কেন্দ্র তৈরির মাধ্যমে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক সামাজিক পুঁজি সৃষ্টিতে বিশ্বাসী। গ্রুপ ও কেন্দ্র প্রধান নির্বাচিত হন বলে গরিবের নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে।

গ্রামীণ ব্যাঙ্ক একটি গতিশীল প্রতিষ্ঠান। দুর্যোগ এলে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সদস্যদের পক্ষে নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করা কষ্টকর হয়। সেজন্য ১৯৯৮-এর বন্যা-পরবর্তী সময় থেকে স্থানীয় শাখা ম্যানেজারকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। সদস্যদের প্রয়োজন অনুযায়ী কিস্তির সময় ও পরিমাণ বদলের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে সেই সব কর্মকর্তাকে যাঁরা মাঠে কাজ করেন। এর ফলে ঋণ-খেলাপি হওয়ার ঝুঁকি আরও কমে গেছে। সদস্যরা চাইলে স্থানীয় ব্যাঙ্ককর্মীর সঙ্গে আলাপ করে নিজেদের প্রয়োজন মতো কিস্তির ধরন ঠিক করে নিতে পারেন। একই সঙ্গে ১৯৯৮-এর পর গ্রামীণ ব্যাঙ্ক সদস্যদের আগের বাধ্যতামূলক গ্রুপ তহবিলের বদলে ব্যক্তিগত এবং বিশেষ সঞ্চয়ী হিসেব খোলার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। ব্যাঙ্ক সদস্যদের জন্য পেনশন তহবিল গঠনের ব্যবস্থা রয়েছে। আট হাজার টাকার বেশি ঋণ নিলে মাসে পঞ্চাশ টাকা পেনশন তহবিলে জমা করতে হয়। দশ বছর বাদে যে টাকা একজন সদস্য জমা করেছেন তিনি তার দ্বিগুণ তুলতে পারেন। এখানে ঋণ বিমা নামের আরেকটি কর্মসূচি চালু আছে। বছরের শেষ দিন এই ঋণ বিমা তহবিলে সামান্য অর্থ জমা দিতে হয়। পরের বছর যদি কোনও কারণে ওই সদস্য মারা যান তা হলে ঋণের পুরো টাকা তাঁর পরিবার পেয়ে যাবে। তা ছাড়া, পরিবার তাঁর বিমা তহবিলে রাখা সঞ্চিত অর্থও সুদ-সহ ফেরত পেয়ে যান।

গ্রামীণ ব্যাঙ্ক এখন একটি স্বনির্ভর প্রতিষ্ঠান। দাতাদের ওপর নির্ভর করে না। পুরো ঋণের নব্বই শতাংশই সদস্য ও অন্যান্য আমানতকারীর অর্থ থেকে মেটানো হয়। বিরাশি শতাংশ আসে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক সদস্যদের আমানত থেকে।

গ্রামীণ ব্যাঙ্কের দেওয়া ঋণের এক-তৃতীয়াংশের মতো যায় মুরগি ও পশুপালনে, এক-চতুর্থাংশ ঋণ যায় প্রসেসিং ও ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে। বাদবাকি ঋণ যায় ছোটখাট ব্যবসা ও দোকানদারিতে। ক্ষুদ্র ঋণ দিয়ে মূলত হয় গরুপালন, পোলট্রির ব্যবসা, চালের মিল, সবজি উৎপাদন, ধান-চালের ব্যবসা, ছোটখাট দোকান পরিচালনা, কাপড়ের ব্যবসা, মোবাইল ফোনের ব্যবসা। এমনভাবে এই ঋণ দেওয়া হয় যে ধনীরা চাইলেও এত সব নিয়মকানুন মেনে নিতে পারে না।

শুধু পুরুষরাই নগদ টাকা আয় করেন, মহিলারা শুধু ঘরের কাজ করেন এই ধারণা ক্ষুদ্র ঋণ ভেঙে দিয়েছে। আজ তাঁরা ক্ষুদ্র ঋণ বয়ে আনছেন বলে সংসারে ও সমাজে গুরুত্ব পাচ্ছেন। তাঁদের সঙ্গে স্বামীর দুর্ব্যবহার কমে গেছে। স্বামীর

মারধর নেই। তাঁরা এখন উল্টে হুমকি দিক পারেন যে তাঁদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা হলে তাঁরা আর ক্ষুদ্র ঋণ আনবেন না। ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে তাঁরা এখন নিজেদের সম্পত্তি গড়ে তুলছেন। নিজের নামে জমি করছেন, নিজের পয়সায় শাড়ি এমনকি গয়নাও কিনছেন। আয় করেন বলে সংসারে শান্তি বেড়েছে। বিয়ে ভেঙে যাওয়ার ঝুঁকি কমে গেছে। পছন্দমতো খেতে পারছেন, বাবা-মাকে উপহার দিতে পারছেন। এখন সংসারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে তাঁদের মতামত নেওয়া হচ্ছে, কাজের চাপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জন্ম নিয়ন্ত্রণের মাত্রা বাড়ছে। পরিকল্পিতভাবে তাঁরা সন্তান নিচ্ছেন। গ্রুপের সদস্য হওয়ার কারণে তাঁদের সাহস বেড়েছে, বেড়েছে সচলতা। তাঁরা দল বেঁধে ঘরের বাইরে যাচ্ছেন। স্বামীর সঙ্গে হাটে-বাজারে যাচ্ছেন। ব্যাঙ্ককর্মীদের সঙ্গে কথা বলছেন। পুরনো ধ্যান-ধারণা বদলে যাচ্ছে। তাঁদের আর শুধু ঘরের মধ্যে আটকে রাখা যাচ্ছে না। সামাজিক পুঁজির বিকাশ ঘটছে। তাঁদের জমানো টাকা সঞ্চয় তহবিলে জমানো হচ্ছে। স্বামী 'ডিভোর্স' দিতে চাইলে এখন আর তাঁরা ভয় পান না। কেন না, তাঁদের হাতে সম্পত্তি ও নগদ টাকা আছে। নারীর আয় এখন আর সাময়িক নয়, সংসারের আয়ের একটা অংশ বাড়ির মহিলার কাছ থেকেই আসছে। এর প্রভাব পড়ছে সমাজে। তিনি সন্তানদের লেখাপড়া করাচ্ছেন। নিজে অন্য সময়ে টেলিভিশন দেখছেন। গ্রামের ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণকারী সদস্যদের আয় রোজগার বাড়ছে বলে বাজারে গিয়ে তাঁরা বিভিন্ন পণ্য কিনছেন। অন্যরাও লাভবান হচ্ছেন। স্থানীয় বাজারের পরিধি বাড়ছে। যদি গ্রামীণ ব্যাঙ্কের মতো প্রতিষ্ঠান না থাকত তা হলে গ্রাম থেকে আরও মানুষ শহরে আসত। শহরের জনজীবন বিপন্ন হয়ে পড়ত। সব মিলে তাঁদের স্বাধীনতার চৌহদ্দি বাড়ছে।

নোবেল পাওয়ার পর স্ত্রী আফরোজের সঙ্গে। সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে।

দারিদ্র্য, গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ও বিশ্বব্যাঙ্ক

মুহাম্মদ ইউনূস বারেবারে বলেছেন, তিনি কোনওদিন বিশ্বব্যাঙ্কের ঋণ নেননি, কারণ বিশ্বব্যাঙ্কের ঋণ নিলে তাঁরা ঋণগ্রহীতার ওপর নিজেদের মত জোর করে চাপিয়ে দেন। অথচ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ও বিশ্বব্যাঙ্ক দুয়েরই মূল বিষয় উন্নয়ন করা। কার উন্নয়ন? কীসের উন্নয়ন? তিনি দারিদ্র্য ও বিশ্বব্যাঙ্ক নিয়ে কী বলছেন তা দেখা যাক।

ক্ষুধা হচ্ছে মানুষের জীবনে সব থেকে বড় বঞ্চনা। ক্ষুধার প্রাথমিক কারণ খাবারের সন্ধান না পাওয়া। খাবার পাওয়া যায় না কারণ তা কেনার ক্ষমতা নেই। আমরা যদি ক্ষুধার সমাপ্তি দেখতে চাই তা হলে দেখতে হবে যাতে সবার খাবার কেনার মতো ন্যূনতম আয় থাকে। ক্ষুধা হচ্ছে দারিদ্র্যের উপসর্গ।

ক্ষুধাকে খাবারের সমস্যা হিসেবে দেখলে চলে না। এটা তার থেকেও বড় সমস্যা। মানুষের উদ্যোগের ক্ষমতাকে সমাজ বেঁধে রেখেছে বলে ক্ষুধার মৃত্যু হচ্ছে না। তাদের উদ্যোগের ক্ষমতা বাঁধা রয়েছে বলেই তাঁরা কাজ পান না, আয়ও করতে পারেন না। এই অবস্থাকেই বলে দারিদ্র্য। দারিদ্র্য গরিবের সৃষ্টি করা নয়। এটা একটা 'ব্যবস্থা'। চিন্তাভাবনা, নীতি, প্রতিষ্ঠানের তৈরি করা 'ব্যবস্থা'। যেদিন এই 'ব্যবস্থা'র বদল করা যাবে সেদিন থেকে বিশ্বে আর দারিদ্র্য থাকবে না।

এখন যে 'ব্যবস্থা' রয়েছে তা আমাদের দারিদ্র্যের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে

নিতে বলে। দারিদ্র্যের কারণে কয়েক কোটি মানুষ মানুষের সম্মান থেকে বঞ্চিত। আর পৃথিবী বঞ্চিত তাদের উদ্যোগ, উদ্যম, সৃজনশীলতা ও উৎপাদনশীলতা থেকে।

প্রতিটি মানুষেরই কিন্তু কিছু সৃজনশীল সম্ভাবনা ও উদ্যম রয়েছে। কিন্তু এখন যে 'ব্যবস্থা' চলছে তাতে অল্প কিছু মানুষের উদ্যোগ ও সৃজনশীলতার উন্মেষ ঘটছে। গরিবরা তাঁদের সম্ভাবনাকে মেলে ধরার সুযোগই পান না। তাঁদের চরম কষ্ট আর অসম্মানের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় কারণ তাঁরা জানেনই না কী সম্ভাবনা তাঁদের মধ্যে রয়েছে, যা দিয়ে তাঁরা পাল্টে ফেলতে পারেন তাঁদের জীবনটাকে। যাঁরা 'ব্যবস্থা'টাকে টিকিয়ে রেখেছেন তাঁরা এর বদল চান না। বদলে তাঁরা গরিবকে দেখান কেবল সহানুভূতি, কখনও বা ছুঁড়ে দেন এক মুঠো ভিক্ষে।

বিশ্বব্যাঙ্ক পৃথিবী থেকে ক্ষুধা দূর করার জন্যে তৈরি হয়নি। উন্নয়নের জন্য এই ব্যাঙ্ক তৈরি হয়েছে। বিশ্বব্যাঙ্কের কাছে উন্নয়ন মানে বৃদ্ধি। বিশ্বব্যাঙ্ক একমনে সেই বৃদ্ধির জন্য ছুটে চলেছে। কিন্তু এখন এর সামনে চলে এসেছে ক্ষুধা, মহিলা, স্বাস্থ্য, পরিবেশের মতো জীবন্ত ইস্যু। বৃদ্ধির মূল লক্ষ্যকে সামনে রেখেই বিশ্বব্যাঙ্ক এই সব জীবন্ত ইস্যুকে সামলাতে চাইছে।

কিন্তু বিশ্বব্যাঙ্ক একটি রক্ষণশীল সংস্থা। চেনা কাঠামোর বাইরে গিয়ে এই সব ইস্যু মোকাবিলা করার মতো মানসিকতা তার নেই। দারিদ্র্য মোকাবিলা করার মতো কোনও কাজ তাদের কাঠামোয় নেই।

তা ছাড়া যাঁরা বিশ্বব্যাঙ্কে কাজ করার জন্য আসেন তাঁদের কখনই পৃথিবী থেকে দারিদ্র্য দূর করার কাজে লাগানো হয় না।

যদি বিশ্বব্যাঙ্ককে দারিদ্র্য দূর করার কাজে লাগাতে হয় তবে এই দুটি বিষয়েরই সমাধান চাই। এজন্যে ব্যাঙ্ককে আবার নতুন করে শুরু করতে হবে।

মুহাম্মদ ইউনূস এটা বিশ্বাস করেন বলেই বলেছিলেন বিশ্বব্যাঙ্কের সদর দপ্তর ঢাকায় করতে হবে। যে দেশে দারিদ্র্য বেশি সেখানেই তার সদর দপ্তর থাকা উচিত। আর যে দেশে দারিদ্র্য আছে তাদের দেশের লোকেরাই দারিদ্র্য দূর করার প্রশ্নটি বুঝবে, তা দূর করায় যত্নবান হবে। সেজন্য দরিদ্র দেশের ভাল ছেলেমেয়েদের বিশ্বব্যাঙ্কে কাজ করা উচিত। বিশ্বব্যাঙ্কের মূল লক্ষ্য হবে দারিদ্র্য সমস্যা কমানো। উন্নয়নের আগে চাই এই লক্ষ্যে থিতু হওয়া। একেবারে গরিব দেশ ধরে ধরে হিসেব করে দারিদ্র্য কমানোর কাজ করতে হবে বিশ্বব্যাঙ্ককে। তারপর কবে পৃথিবীকে পুরোপুরি গরিবিমুক্ত করা যায় তার সঠিক সময় নির্দিষ্ট করতে হবে। সেই রুটিন অনুযায়ী চলবে দারিদ্র্য কমানোর কাজটা। তাতেই একদিন গরিবিমুক্ত হবে বিশ্ব। এর জন্য পদ্ধতি ঠিক করতে হবে। বিশ্বব্যাঙ্কের কাজ এমনভাবে করতে হবে যাতে তা যায় গরিবের পক্ষে। এমন লোকদের দিয়ে কাজ করাতে হবে যাঁরা দারিদ্র্যমুক্ত পৃথিবীর ব্যাপারে বিশ্বাস করেন।

যতদিন না পর্যন্ত বিশ্বব্যাঙ্ক এ কাজ করছে ততদিন তারা একটা গরিবিমুক্ত পৃথিবীর জন্য আলাদা জানলা করুক। সেই জানলা দিয়ে কেবল দারিদ্র্যমুক্ত বিশ্বের কাজ হবে। বিশ্বব্যাঙ্কের অন্য যা যা প্রকল্প আছে তার সঙ্গে গরিবি হটাওকে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। গরিবিমুক্ত করার জন্য বিশ্বব্যাঙ্ক যে জানলা উন্মুক্ত করবে তার কাজ শুধু সেই বিশেষ লক্ষ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। সেই জানলায় যাঁরা কাজ করবেন তাঁরা যেন না ভাবেন দারিদ্র্য মুক্তি সংক্রান্ত সব প্রশ্নের জবাব তাঁদের কাছে রয়েছে। কাজ করতে করতে অনেক কিছু শেখা যায়, শেখা যায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে। তাঁদের যেন কাজ করতে করতে যে শেখা যায়, সেই উপলব্ধি বা সেই বিনয় থাকে।

দারিদ্র্যমুক্ত পৃথিবী গড়তে গেলে বিশ্বব্যাঙ্কের পরিবর্তন দরকারই। যে-সব ব্যাঙ্ক উন্নয়নের জন্য কাজ করে তার মধ্যে বিশ্বব্যাঙ্ক নিশ্চয়ই সব থেকে প্রথমে আছে। অন্যান্য আন্তর্জাতিক বা বিভিন্ন দেশের উন্নয়ন সংক্রান্ত ব্যাঙ্কগুলি এ ব্যাপারে বিশ্বব্যাঙ্ককে অনুসরণ করে। এমনকি নন-ব্যাঙ্কিং যে-সব উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান আছে তারাও বিশ্বব্যাঙ্ক নিয়ে কখনও কোনও প্রশ্ন তোলে না। এর প্রভাব সর্বত্র এবং সর্বাত্মক। বিশ্বব্যাঙ্ককে না পাল্টালে অন্য যে-সব ব্যাঙ্ক বা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান যারা বিশ্বব্যাঙ্ককে অনুসরণ করে তাদেরও বদল ঘটাতে পারা যাবে না।

আমরা বিশ্বাস করি, অল্প কিছু টাকা খরচ করলেই দারিদ্র্য দূর করা যাবে। দারিদ্র্য দূর করার মূল চাবিকাঠিটি আমরা পেয়ে গেছি, এখন দরকার তার শাখাপ্রশাখা মেলে ধরার।

এখন মানুষের মনে ধারণা আছে গরিবরা তাদের দারিদ্র্যের জন্য দায়ী। এই ধারণাকে আঁকড়ে থাকলে দারিদ্র্য দূর করা যাবে না। এখনও অধিকাংশ মানুষ মনে করেন গরিবরা কাজ করে না, কুঁড়ে বলে তারা গরিব থেকে যাচ্ছে, তারা গরিব কারণ তাদের দক্ষতা নেই, উদ্যম নেই, তাদের বড় হওয়ার কোনও ইচ্ছেও নেই, তারা মদ্যপান করে বা নেশার ওষুধ নেয়। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে গরিবি হটানোর জন্য বিভিন্ন প্রকল্প নেওয়া হয়। হয়ত তাদের মদ্যপান ছাড়ানোর জন্য প্রকল্প নেওয়া হল, কিংবা এমন প্রকল্প নেওয়া হল যাতে তাঁরা তাঁদের মনোভাব পাল্টাতে পারেন। 'মনোভাব' বলতে সেই মনোভাবকেই জানি, যেটা আমরা তাঁদের 'মনোভাব' বলে বুঝি। স্বাভাবিকভাবেই আমরা গরিবি হটাওয়ে খুব একটা সফল হই না কারণ আমরা ভুলভাবে শুরু করি।

আমরা বাংলাদেশে গরিবদের অন্যভাবে দেখি। আমরা মনে করি পৃথিবীর অন্য যে-কোনও জায়গার মানুষের মতোই তাঁরা উদ্যোগী। তাঁরাও 'পারেন' এটাই আমাদের বিশ্বাস। অবস্থাটা এমন যে তাঁরা পিছনে পড়ে আছেন। তাঁরা অন্য যে-কোনও মানুষের মতোই পরিশ্রম করতে পারেন। যেটুকু সংস্থান তাঁরা করেন তা পরিশ্রম করেই করেন। অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে দিলে তাঁরা আর পিছিয়ে

থাকবেন না। এই মানুষগুলোই তো প্রতিনিয়ত প্রমাণ করছেন যে তাঁদের টাকা দিলে তাঁরা পরিশ্রম করে রোজগার করেন। ঋণ ফেরতও দেন। কিন্তু প্রচলিত ব্যাঙ্কগুলো এঁদের অস্পৃশ্য মনে করে। এখনও তারা তাই মনে করে চলেছে!

কোনটা ঠিক? প্রচলিত ধারণা না আমাদের অভিজ্ঞতা? আমরা প্রথম দিকে এ নিয়ে চিন্তা করতাম। কিন্তু আমরা এখন বাংলাদেশের সব গ্রামে পৌঁছে গেছি। আমাদের অভিজ্ঞতাই ঠিক বলে প্রমাণিত। অভিজ্ঞতায় দেখেছি গরিবদের ঋণ দিলে তাঁরা আয় করতে পারেন, আয় বাড়াতে পারেন, সম্মানজনক জীবনযাপন করতে পারেন, সব থেকে বড় কথা দারিদ্র্যসীমা অতিক্রম করতে পারেন। আমরা সমীক্ষা করে দেখেছি গ্রামীণ ব্যাঙ্ক যে-সব পরিবারে ঢুকেছে তারা পুষ্টিকর খাবার খেতে পারে। অ-গ্রামীণ গরিব পরিবারে এমনটা দেখা যায় না। গ্রামীণ ব্যাঙ্ক পরিবারে অ-গ্রামীণ ব্যাঙ্ক পরিবারের তুলনায় শিশুমৃত্যুর হার কম। আবার গ্রামীণ ব্যাঙ্ক পরিবারে যেরকমভাবে পরিবার পরিকল্পনা করা হয় অ-গ্রামীণ ব্যাঙ্ক পরিবারে ততটা হয় না। গ্রামীণ ব্যাঙ্কই দেখিয়েছে মহিলাদের সমাজে একটা উঁচু জায়গা আছে কারণ তাঁরা আর্থিকভাবে স্বনির্ভর।

যদি আমাদের প্রচলিত ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাকে একটু বদল করা যায়, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ব্যাঙ্কগুলিকে যদি একটু পাল্টানো যায় তবে গরিব দারিদ্র্যসীমার ওপর উঠে আসবে তাড়াতাড়ি।

গ্রামীণ ব্যাঙ্ক বিশ্বব্যাঙ্কের মতো করে কাজ করে না। যদি কোনও কিছু ঠিক না চলে তবে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ঋণগ্রহীতাকে দোষ দেয় না। গ্রামীণ ব্যাঙ্ক দোষ দেয় নিজেকে। আমাদের কর্মীদের আমরা সেভাবেই প্রশিক্ষণ দিই। ভুলের দায় তাঁরা তাঁদের কাঁধে তুলে নেন। 'তুমি ঠিক করে কাজ করনি, তাই ভুল হয়েছে। ঋণগ্রহীতাদের ভুলে ভুল হয়নি।'

আমরা আমাদের ব্যাঙ্ক ম্যানেজার, ব্যাঙ্ককর্মীদের অন্যভাবে প্রশিক্ষণ দিই। 'যিনি কিস্তি শোধ করতে পারছেন না তাঁর ওপর কোনও রাগ নয়। সেই অবস্থায় কিস্তি শোধের ওপর তাঁকে কোনও চাপ দেওয়া যাবে না। তাঁকে আপনার শত্রু করে দেবেন না। ঋণগ্রহীতা আপনার বন্ধু, আপনিও তাঁর পরম মিত্র। তিনি কিস্তি শোধ দিতে না পারলে আপনার প্রথমেই মনে হবে তিনি নিশ্চয়ই কোনও অসুবিধায় আছেন তাই কিস্তি শোধ দিতে পারছেন না। এ সময়ে আপনার উচিত তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ানো , তাঁকে সাহায্য করা।'

ঋণের কিস্তি কেউ শোধ দিতে না পারলে আমরা আমাদের ম্যানেজার, ব্যাঙ্ককর্মীদের অন্য রকম পরামর্শ দিই। 'প্রথমে আপনি জানুন তিনি কেন শোধ দিতে পারছেন না। আমাদের অভিজ্ঞতা বলে কিস্তি শোধ না দেওয়ার পেছনে রয়েছে কোনও করুণ কাহিনী। সবটা জানার পর আপনার মন বলবে কিস্তি শোধের জন্য যদি এঁর ওপর জোরাজুরি বা চাপাচাপি করতাম তা হলে বোকামি

আর অন্যায় হত। হতে পরে তাঁর স্বামী তাঁর টাকা জোর করে নিয়ে পালিয়ে গেছেন। তখন একজন বন্ধু হিসেবে আপনার দায়িত্ব হবে স্বামীকে খুঁজে বের করে তাঁর কাছ থেকে টাকাটা আদায় করা। এমনও হতে পারে, ঋণের টাকা দিয়ে তিনি যে গরুটি কিনেছিলেন সেটি মারা গেছে। এই বিপদে আপনি তাঁর মনে সাহস জোগান। তিনি হয়ত এই বিপদে ভেঙে পড়েছেন। আপনি তাঁর মনে ভরসা জোগান। আপনি তাঁকে আবার ঋণ দিন। এবার পুরনো ঋণটাকে দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ হিসেবে বিবেচনা করুন।'

গ্রামীণ ব্যাঙ্কে এলে কেউ যেন আর বাড়তি দুঃখ না পান। এমনিতেই তাঁরা দুঃখ কষ্টে থাকেন। তাঁদের কষ্ট কমানোর জন্যই আমাদের যত প্রচেষ্টা। তাঁরা যেন একবারও না মনে করেন গ্রামীণ ব্যাঙ্ক তাঁদের কষ্ট কমানোর থেকে কষ্ট বাড়িয়ে দিল। তা যদি আমরা না করতে পারি, তবে আমাদের ব্যাঙ্কের ঝাঁপ ফেলে দিতে হবে। আমাদের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে।

বিশ্বব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়েছে এমন বিভিন্ন দেশের ওপর বিরাট ঋণের বোঝা চাপে। তখন ঋণ শোধের নামে বিশ্বব্যাঙ্ক নানা রকম প্রস্তাব দিয়ে কষ্ট লাঘবের থেকে দুঃখ বাড়িয়ে দেয়। এর থেকে আমরা বুঝি গ্রামীণ ব্যাঙ্ক আর বিশ্বব্যাঙ্কের মধ্যে কত দুস্তর ফারাক।

আমরা জানি নাক কান মুলে বিশ্বব্যাঙ্ক ওই সব দেশ থেকে ঋণ আদায় করে। এরজন্যে হয়ত ওই সব দেশকে তার আমদানি থেকে আয় দিতে হয়, কিংবা অতিরিক্ত আয় করার জন্যে হয়ত অতি দামি সম্পদকে নামমাত্র পয়সায় লিজ দিতে হয়, কিংবা ঋণ শোধের জন্য সামাজিক ও পরিবেশগত দিককেও অবহেলা করতে হয়। আমরা একে ব্যাঙ্কিং বলি না। মানুষকে দুর্দশার মধ্যে ফেলা, একটা জাতিকে দুরবস্থার মধ্যে ফেলার নাম, আর যাই হোক, ব্যাঙ্কিং নয়।

আমরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কে বিশ্বাস করি, ঋণগ্রহীতা আমার থেকে বেশি জানেন, বেশি অনুভব করেন। আমরা ঋণগ্রহীতাকে তাঁর সিদ্ধান্ত নিজে নিতে উৎসাহিত করি। বিশ্বব্যাঙ্কের ধারণা সম্পূর্ণ উল্টো।

থতমত খেয়ে যাওয়া কোনও ঋণগ্রহীতা আমাদের ম্যানেজার বা ব্যাঙ্ককর্মীকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করেন। 'আপনি একটা ভাল ব্যবসার কথা বলতে পারেন না?' এ ব্যাপারে ব্যাঙ্ক ম্যানেজার, কর্মীদের পরামর্শ দেওয়া আছে। তাঁরা বলেন,

— আমি দুঃখিত। আপনাকে ভাল ব্যবসার কথা বলার মতো তেমন যোগ্যতা আমার নেই। গ্রামীণ ব্যাঙ্কের টাকা আছে। কিন্তু ব্যবসার আইডিয়া নেই। গ্রামীণের যদি ব্যবসার আইডিয়া থাকত তা হলে ব্যাঙ্ক আপনাকে টাকা দিত না। সেই টাকা দিয়ে গ্রামীণ ব্যাঙ্কই ব্যবসা করে আরও টাকা বাড়াত।'

কিন্তু বিশ্বব্যাঙ্কের কথা একদম আলাদা। তারা টাকা দেয়। তারপর তারা সেই টাকা দিয়ে কী করতে হবে বলে দেয়, সেই কাজ করার জন্যে তারা তারপর

বিশেষজ্ঞ পাঠায়, তারপর ঠিক সেইমতো কাজ হচ্ছে কী না তা দেখাশোনা করে। যিনি ঋণগ্রহীতা তাঁর কাজ হচ্ছে বিশ্বব্যাঙ্কের দেওয়া লাল, হলুদ, সবুজ লাইন দেখে দেখে, তাদের নির্দেশ অনুসরণ করা, সব মোড়ে মোড়ে একবার করে থেমে তাদের নির্দেশ শুনে নেওয়া, আবার তা অনুসরণ করা। বিশ্বব্যাঙ্কই ঋণগ্রহীতার সব দায়দায়িত্ব নিয়ে নেয়। ঋণগ্রহীতার জন্যে কোনও দায়িত্ব পড়ে থাকে না। একেবারে কোনও দায়িত্ব পড়ে থাকে না বললে অবশ্য মিথ্যে বলা হবে। প্রকল্প ব্যর্থ হলে তার দায়ভার নিতে হয় ঋণগ্রহীতাকেই। সেই মহান দায়ভার বর্তায় তাঁর ওপর।

এইভাবে প্রকল্পের ব্যর্থতার দায়িত্ব ঋণগ্রহীতার ওপর চাপানোর অর্থ গরিবদের কষ্ট দেওয়া। মানবিক পথ ধরে ব্যাঙ্কিং এগনো উচিত। দারিদ্র্যের পক্ষে লড়া উচিত ব্যাঙ্কিংয়ের। বিশ্বব্যাঙ্ক পৃথিবীর সব থেকে বড় আর্থিক প্রতিষ্ঠান। বিশ্বব্যাঙ্কের উচিত দারিদ্র্যমুক্ত পৃথিবী গড়ার জন্য তার সব জোর নিয়ে, সব শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া।

গ্রামীণ ব্যাঙ্ক বিশ্বাস করে, দারিদ্র্য কৃত্রিমভাবে তৈরি করা। 'আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হল আমাদের প্রতিষ্ঠান এবং আমাদের রীতিনীতিগুলোকে নতুন করে সাজাতে হবে। তা হলে একজন অভাবী মানুষও দুনিয়ায় থাকবে না। যাদের কিছুই নেই, তাদের কখনও ঋণ পাওয়ার যোগ্য মনে করা হয়নি, আমরা তাদের হাতে ঋণের টাকা তুলে দিয়েছি এবং এই বুদ্ধি কাজে দিয়েছে। আর সেটাই পাল্টে দিয়েছে আগেকার সব হিসেব নিকেশ।'

নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর সাংবাদিক সম্মেলনে

সেদিন ঢাকায়

১৩ অক্টোবর। ২০০৬। বাংলাদেশের সময় দুপুর দুটো পঞ্চাশ মিনিট। ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বাড়িতে একটি ফোন আসে। নরওয়েজিয়ান টেলিভিশনের ফোন। 'স্যার আপনি সম্ভবত নোবেল পুরস্কার পাচ্ছেন। দয়া করে লাইনে থাকুন। আর দশ মিনিটের মধ্যে ফলাফল ঘোষিত হবে। সঙ্গে সঙ্গে আপনার একটি সরাসরি সাক্ষাৎকার সম্প্রচার করা হবে।'

এর পরের দশ মিনিট যেন আর ফুরোতে চায়নি ড. ইউনূস ও তাঁর পরিবারের।

দশ মিনিট পর এল সেই ফোন।

— স্যার আপনাকে অভিনন্দন।

তাঁর নোবেল প্রাপ্তির খবর শুনে পুরো পরিবার কিছু সময়ের জন্যে চুপ হয়ে যায়। এরপর আনন্দ আর ভালবাসায় জড়িয়ে ধরেন পরিবারের সদস্যরা। একটার পর একটা ফোন আসতে থাকে। শুভেচ্ছা, অভিনন্দন যেন আর ফুরোতেই চায় না।

পরের ক'দিনও অভিনন্দনে ভেসে গেলেন তিনি। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর তিনি গেলেন চট্টগ্রাম, যেখান থেকে তাঁর কাজ শুরু হয়েছিল। ১৬ অক্টোবর ঢাকায় তাঁর গণসংবর্ধনা।

চীন-বাংলাদেশ মৈত্রী কেন্দ্রের সম্মেলন কক্ষে ওই গণসংবর্ধনায় অধ্যাপক ইউনূস বললেন, 'বাংলাদেশের মাছের বাজারে যদি দেখেন কেউ মাছ বিক্রি করছেন তবে তিনি হতেও পারেন নোবেল বিজয়ী। হয়ত তিনি গ্রামীণ ব্যাঙ্কের

সদস্য। আজ বাংলাদেশের তেষট্টি লক্ষ মহিলা নোবেল বিজয়ী।' নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর ঢাকায় তাঁর প্রথম সংবর্ধনা। প্রথমে গ্রামীণ ব্যাঙ্কে। সংবর্ধনায় আতিশয্য ছিল না, ছিল আবেগের প্রাচুর্য। ফুলের প্রতুলতা। ঢাকায় সেদিন ফুলের অভাব। ফুলের দাম চড়েছে। যে গোলাপ একশো টাকা ডজন, আজ তা বিকিয়েছে দু'শো টাকায়। তাও সজীব ফুল খুঁজতে হয়েছে হন্যে হয়ে। নামীদামি রঙিন নাম-না-জানা বিদেশি ফুল থেকে হলুদ-লাল-গোলাপি গোলাপ, রজনীগন্ধা, শ্বেতশুভ্র লিলি, হলুদ ক্রিসানথিমাম ফুলের গুচ্ছ এসেছে তাঁর হাতে। তোড়ায় তোড়ায়। এ ফুলের গুচ্ছ ও ফুলের গুচ্ছকে বলতে চায়, অধ্যাপক ইউনূসকে সংবর্ধনা দেওয়ার জন্যে আমি আরও আরও সতেজ, সজীব, সুগন্ধী, সুন্দরী, বর্ণিল। প্রথমে গ্রামীণ ব্যাঙ্কে, তারপর চীন-বাংলাদেশ মৈত্রী কেন্দ্রের সম্মেলন কেন্দ্রে তিনি ভেসে গেছেন সংবর্ধনার তোড়ে, আবেগের জোয়ারে। যাঁরা বড় বর্ণিল ফুলের গুচ্ছ আনতে পারেননি এমন মানুষও এসেছেন। যেমন গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সদস্যদের একদল ফুটফুটে মেয়ে। তাদের কারও হাতে একটা গোলাপ, কারও বা তাও নেই— আছে হাসি। আর কণ্ঠে ছিল তাদের সুর। গ্রামীণ উদ্যোগের চেক-শাড়ি পরে সেজেছিল ফুলের মতো সেই মেয়েরা। তারা গান গেয়েছিল, 'শুনেন শুনেন দেশবাসী গ্রামীণ ব্যাঙ্কের বর্ণনা... গরিব বলে আমরা মানুষ নই কি না?' অধ্যাপক ইউনূস এঁদের জন্যই কাজ করেছেন। তিনি এত সংবর্ধনা পাচ্ছেন যে নিজেই বললেন, 'আমি বলছি আমাকে জড়িয়ে ধরবেন না। জড়িয়ে ধরছেন চেপে। আমার বুক ব্যথা হয়ে গেল। ' তবু মানুষ শুনছেন না। তাঁর সঙ্গে একটু হাত মেলানো, একটু জড়িয়ে ধরার প্রাণঢালা আবেগ কিছুটা তবু প্রশমিত হয়। কেউ তাঁকে দিতে পারছে না একটা ফুলও। তিনি দিচ্ছেন এক ফোঁটা আনন্দের অশ্রুবিন্দু। তাই মুক্তো হয়ে ঝরে পড়ছে। তিনি যেখানেই যাচ্ছেন, তাঁর পিছনে পিছনে পিলপিল করে মানুষ যাচ্ছেন। ঘিরে ধরছেন তাঁকে। সেদিন সব নিরাপত্তার বাঁধ ভেঙেছিল। সেই সংবর্ধনায় কে যে মন্ত্রী, কে যে বিচারপতি, কে যে দূতাবাসের হোমরাচোমরা কূটনীতিক— সব মিলেমিশে একাকার। কোনও ভেদাভেদ ছিল না। কী এক গভীর অধিকারবোধ অধ্যাপক ইউনূসের প্রতি। কী আন্তরিক সে ছবি! তাঁর নিজের ব্যাঙ্ক— গ্রামীণ ব্যাঙ্কে ঢুকতেও তাঁকে ভিড় ঠেলতে হয়েছে। প্রাণঢালা ভিড়। পাঁচতলায় তিনি। এ ধারে এক কাচের ঘর। সেই কাচের চারদিকে চেক-কাপড়ের পর্দা ঝুলছে। হলুদ, লাল, সবুজ, নীল গ্রামীণ উদ্যোগের যতরকম চেক-কাপড় রয়েছে সম্ভবত তার সব ক'টি দিয়েই একটি করে পর্দা তৈরি করে পাশাপাশি ঝুলিয়ে দিয়ে কাচের ঘরে ঘেরাটোপ করা হয়েছে। গ্রামীণ উদ্যোগ গ্রামীণ ব্যাঙ্কেরই তুতো বোন। সামনে লেখা: মংগা আর নয়। লালের ওপর হলুদ দিয়ে লেখা। অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ, অনাহার আর নয়। দুপুরে তিনি আগারগাঁয়ে গণসংবর্ধনায় গেলেন, সেখানে সে এক সুবিশাল সমাবেশ। ভেতরে যত লোক

ধরে, গেছেন তার দ্বিগুণ। অর্ধেক দাঁড়িয়ে। সেখানে মঞ্চে লালের ওপর লেখা ছোট্ট দুটি শব্দ: 'আমরা পারি'। একেবারে বাঙালির মনের কথা। গণসংবর্ধনায় বলা হল, আমরা তাড়াহুড়োয় একটা মানপত্র পর্যন্ত তৈরি করতে পারিনি। এত কাছের মানুষ নোবেল পুরস্কার পেলে যে কী করতে হয়, তা আমরা জানি না, বুঝতে পারছি না। আর এ পুরস্কার তিনি একা পাননি, পেয়েছেন গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ছেষট্টি লক্ষ সদস্য। ছেষট্টি লক্ষ মানুষের একসঙ্গে নোবেল পাওয়ার ঘটনা এই প্রথম। এ এক অভূতপূর্ব ইতিহাস। সেই সংবর্ধনাকক্ষে উঠে এল অমর্ত্য সেনের নাম। তাঁরা মঞ্চে বললেন, অর্থনীতিকে মানবিক স্থান দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন অমর্ত্য সেন। তিনি তার প্রবর্তক। আর অধ্যাপক ইউনূস তার পথনির্দেশক। অধ্যাপক ইউনূস বললেন, 'আমি আগেও বহু পুরস্কার পেয়েছি। কিন্তু এমন প্রতিক্রিয়া আগে কখনও দেখিনি। আমার যাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব, যাদের সঙ্গে খুনসুটি করি তারাও হঠাৎ আমাকে অভিনন্দন জানাতে লাগল। এক ট্রাকচালক গাড়ি থামিয়ে নেমে আমার গাড়ির জানলা দিয়ে উঁকি মেরে হেসে জড়িয়ে ধরার ইঙ্গিত করলেন। তাঁর মুখে সে কী তৃপ্তি! দেশ জুড়ে তোলপাড় হচ্ছে। চট্টগ্রামে আমার সহকর্মী অধ্যাপক ফুঁপিয়ে কাঁদলেন। কান্না তাঁর থামতেই চায় না। আমরা যখন জোবরা গ্রামে কাজ শুরু করলাম, তখন আমি শিক্ষক ছিলাম। কয়েকজন ছাত্রকে নিয়ে কাজ শুরু করি। বলেছিলাম, দেখি তো এদের জন্যে কিছু করা যায় কি না। কোনও বিদেশি সাহায্য নেই, কোনও সরকারি সাহায্য নেই। জোবরা গ্রামে ঠেলাঠেলি করে কাজটা শুরু করেছিলাম। চট্টগ্রামের একটা গ্রামে যার জন্ম তা-ই আজ দুনিয়ায় ছড়িয়ে গেল। গরিবগুর্বোদের মডেল হয়ে গেল। গতকাল সেই জোবরা গ্রাম বলল, আমরা পেয়েছি নোবেল। পাঁচ কোটি আমাদের, পাঁচ কোটি আপনার। ভাবুন, তেষট্টি লক্ষ মহিলা নোবেল জয়ী! যাদের দিকে নজর দিই না তারা আজ নোবেল এনেছে। একটা অখ্যাত গ্রাম জন্ম দিল নোবেল পুরস্কারের। গ্রামের নাম জোবরা। জোবরা জিন্দাবাদ। জোবরা জয়ী।

তাঁর সাক্ষাৎকার

নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর ঢাকার মিরপুরে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সদর দপ্তরে তাঁর এক সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। তারই অংশবিশেষ এখানে তুলে দেওয়া হল।

● খোলা বাজারের অর্থনীতি সম্পর্কে আপনার কী মত?

অধ্যাপক ইউনূস: এখন যা পরিস্থিতি, তাতে খোলা বাজার ছাড়া গত্যন্তর নেই। এখন ব্যবসায়, শিল্পে প্রতিযোগিতা রয়েছে সারা বিশ্ব জুড়ে। এর বাইরে কী করে কী হবে?

● আপনি সামাজিক ব্যবসার কথা বলছেন। কিন্তু মুনাফা ছাড়া কি ব্যবসা সম্ভব?

অধ্যাপক ইউনূস: গ্রামীণ ব্যাঙ্ক যেমন সনাতন ব্যাঙ্কিংয়ের বাইরে একটা বিকল্প ব্যবস্থা, তেমনি সামাজিক ব্যবসাও হতে পারে। যেমন ধরুন, সরকারকেই রাস্তা তৈরি করতে হবে তার কোনও মানে নেই। সাধারণ মানুষ বিকল্প ঋণ ব্যবস্থার মাধ্যমে টাকা তুলে রাস্তা বানাল। তার ওপর টোল বসল। সেই টোল দিয়ে নতুন রাস্তা বানানো হবে। এক্ষেত্রে অবশ্য ছোট করে শুরু করতে হবে। প্রথমেই বড় সেতু বানাব, তা ভাবলে হবে না। গ্রামে এরকম অসংখ্য জায়গা আছে, আপনার দেশেও আছে, আমাদের দেশেও আছে। একটা ছোট রাস্তা বানিয়ে, টোল বসিয়ে শুরু করা হোক না।

● অমর্ত্য সেনের সঙ্গে আপনার ফারাক কোথায়?

অধ্যাপক ইউনূস: আমরা দুজনেই দারিদ্র্য নিরসনের কথা ভাবি। তিনি তাত্ত্বিক দিক থেকে বিষয়টির সমাধান খুঁজেছেন। আমি বাস্তবে করে দেখাতে চেয়েছি।

● আপনার গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সদস্যদের ছিয়ানব্বই শতাংশ মহিলা কেন? তাঁরা কি বেশি সৎ? বেশি আন্তরিক?

অধ্যাপক ইউনূস: আমি যখন তিরিশ বছর আগে কাজটা শুরু করি, তখন ব্যাঙ্কিং নিয়ে আমার এটুকুই ধারণা ছিল যে, সনাতন ব্যাঙ্কগুলো মহিলাদের ঋণ দিতে চায় না। তারা সৎ কি না, পুরুষরা বেশি দক্ষ কি না, এ বিষয়ে আমার মতামতের স্লেটটা ফাঁকা ছিল। তাই আমি গ্রামীণ ব্যাঙ্ক শুরু করে বলেছিলাম পঞ্চাশ শতাংশ মেয়েকে ঋণ দেব, পঞ্চাশ শতাংশ পুরুষকে। কিন্তু প্রথম ছ'বছরে আমি দেখলাম মহিলারা এসে বলছেন, আমার স্বামীকে ঋণ দাও। আমি শুনিনি। আমি ওই সব মহিলার ভয় জয় করেছি অনেক ঠেলেঠুলে। তারপর ছ'বছর পর দেখলাম, মহিলারা ঋণ নিতে এগিয়ে আসছেন। আস্তে আস্তে আমার অভিজ্ঞতা হল এই যে, মহিলারা টাকা-পয়সার ব্যাপারে অনেক সতর্ক। আমার মাইক্রো ক্রেডিট সিস্টেম, অর্থাৎ ক্ষুদ্র ঋণ। তাঁরা জানেন অল্প টাকায় কী করে চলতে হয়। আসলে, অভাবের সংসারে টানাটানি করে চালাতে মেয়েরা অভ্যস্ত। দেখলাম, তাঁরা ঋণ শোধের ব্যাপারেও খুব সজাগ। তখন আমার প্রথম দিককার ভাবনা যে পঞ্চাশ শতাংশ ছিল, তা বেড়ে হল ষাট। আমার দেখাটা ভুল ছিল না বলে সেটা ক্রমশ বাড়তে লাগল— ষাট থেকে সত্তর , সত্তর থেকে আশি , নব্বই। এখন

ছিয়ানব্বই। এটা তৃণমূল স্তরের অর্থনীতিকে পাল্টে দিয়েছে। এখন আমি প্রতি বছরে আটশো মিলিয়ন আমেরিকান ডলার ঋণ দিই। ওদের টাকাই রোল করে। অর্থাৎ, যিনি টাকা নিচ্ছেন তিনি ফেরত দিচ্ছেন, আবার বেশি টাকা ঋণ নিচ্ছেন, সঙ্গে নতুন সদস্য ঋণ পাচ্ছেন বা অন্যরা নতুন ঋণ পাচ্ছেন। এভাবে টাকা জমা হচ্ছে, আবার ঋণ হতে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমি শুরুটাই তো করেছি নিজের পকেট থেকে। কোনও সরকারি বা বিদেশি সাহায্যে যাইনি। সরকারি সাহায্য নিলে অনেক কানুন আছে। বিদেশি সাহায্য নিলে তাদের কাছে অনেক কিছু প্রমাণ করতে হবে। কাগজে ছেপে বের করতে হবে— আমি এই করেছি, সেই করেছি। আমি সে পথে যাইনি। আমার মতো করে ধীরে ধীরে করেছি। এখন তো আমি বিশ্বাস করি এভাবে সেতু তৈরিও সম্ভব। চট্টগ্রামের মহিলারা হয়ত একটা মেগা বন্দরের মালকিন হতে পারেন। শুধু তা-ই বলি কেন, শিক্ষা, অন্য সব পরিকাঠামোর মালিকই হতে পারেন জনগণ। যা তাঁদেরই পয়সায় তৈরি। যে পদ্ধতিতে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের টাকা হাত ঘোরে, সেই পদ্ধতিতে। একটু থেকে অনেক।

● আপনার গ্রামীণ ব্যাঙ্কের জন্য কতটা দারিদ্র্য দূর হয়েছে?

অধ্যাপক ইউনূস: জীবনযাত্রার মানের উন্নতি হচ্ছে। একটা সমীক্ষায় দেখা গেছে, যেখানে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক কাজ করেছে, সেখানে আটান্ন শতাংশ মানুষকে দারিদ্র্যসীমার ওপরে তোলা গেছে। কিন্তু তারা হচ্ছে নিরক্ষর। তা সত্ত্বেও কাজটা করা গেছে। তাদের ছেলেমেয়েরা স্কুলে যায়। আমাদের গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সদস্যের ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠানোর জন্য বলি। তাঁদের মধ্যে যাঁরা মেধাবী তাঁদের জন্য আমরা আলাদা টাকা খরচ করি। আমাদের বৃত্তিতে তাঁদের অনেকেই পি এইচ ডি করেছেন, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হয়েছেন।

● আপনি তো এর আগেও বহু আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছেন। নোবেল পেয়ে কী মনে হচ্ছে?

অধ্যাপক ইউনূস: এতে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের আরও উপকার হবে। আরও গ্রামীণ পরিবারের কাছে আমরা পৌঁছতে পারব। দেশের-বিদেশের মানুষ আমাদের সম্পর্কে আরও জানলেন, সচেতন হলেন। আমাদের ফর্মুলা বিশ্বের দরজায় জায়গা পেল। এই পুরস্কারে হঠাৎ চেনা ছবিটা আরও আলো পেল।

● আপনি অর্থনীতিতে না পেয়ে শান্তিতে নোবেল পেলেন। আপনার মতামত?

অধ্যাপক ইউনূস: আমি গ্রামে অভাব দূর করতে পারলে, অশান্তি দূর করতে পারব। অভাব অশান্তি আনে। এরকম করে সারা পৃথিবীর সব অভাব ঘোচাতে পারলে দেখবেন, সেদিন জগৎ সত্যিই শান্তিময় হয়ে উঠেছে। আমি বলব অভাব থেকে শান্তির পথে যাওয়ার রাস্তা—অভাব দূর করা। এই পুরস্কার শান্তির পক্ষে এক বড় অনুপ্রেরণা। অর্থনৈতিক টেনশন থেকে সামাজিক টেনশন হয়। এ কথা

আজ প্রমাণিত সত্য। বড়লোক দেশ গরিব দেশের ওপর জুলুম করে। টেনশন তারও। সেজন্য এই দারিদ্র্য দূরীকরণ টেনশন তাড়ানোর মোক্ষম অস্ত্র। তবে পথটা কঠিন। সবটা করতে সময় লাগবে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি ধীরেই চলি না কেন, অন্তত চলি, এগোই। বড় ট্রাক বড় লেন দিয়ে চলবে। চলুক না সাইকেল রিকশা— পাশের ধীরে চলা লেন দিয়ে। কিন্তু এগোক।

● আপনার গ্রামীণ ব্যাঙ্কের মূল স্লোগান যদি বলতে বলি, আপনি কী বলবেন?

অধ্যাপক ইউনূস: আমরা পারি।

● আপনি সব সময়ে গ্রামীণ উদ্যোগের জামা পরেন?

অধ্যাপক ইউনূস: ট্রাউজার আর এই চেক কাপড়ের পাঞ্জাবি। এই আমার পোশাক। গ্রামীণ উদ্যোগের চেক কাপড় থেকে তৈরি।

● অমর্ত্য সেন প্রতীচী ট্রাস্ট করে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে কিছু কাজ করছেন। আপনিও কি গ্রামীণ ব্যাঙ্কের কাজ পশ্চিমবঙ্গে করতে চান?

অধ্যাপক ইউনূস: আমি করতে চাই। কিন্তু তাতে সরকারি নিয়মকানুন এত আছে যে, পেরে উঠব বলে মনে হয় না। তবে জানি, যে সোশ্যাল বিজনেস এন্টারপ্রাইসের কথা বলেছি, তা পশ্চিমবঙ্গে হতে পারে। অর্থাৎ, সামাজিক ব্যবসায়িক উদ্যোগ। পশ্চিমবঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সে কাজ করা যেতে পারে। অর্থাৎ, ব্যবসা হবে কিন্তু মুনাফা ছাড়া। যে-কোনও বিনিয়োগকারী এই সামাজিক ব্যবসার ফর্মুলা নিতে পারেন।

নোবেল পাওয়ার আনন্দে মেয়ে দিলা।

দুষ্টু ছেলের বিশ্বজয়

সে ছিল এক দুষ্টু ছেলে। চট্টগ্রামে বক্সিরহাট রোডে একধারে সোনাপট্টি। মণিকারদের অঞ্চল। সে থাকত সেই রাস্তার ধারে এক দোতলা বাড়িতে। বাবা ছিলেন স্বর্ণব্যবসায়ী। এমনিতে ছেলেদের বকতেন না। কিন্তু পড়াশোনা না করলে অন্যরকম। তাঁর পায়ের শব্দ সেই ছেলেটির চেনা ছিল। ছেলেরা পড়ছে কি না তিনি দেখতে আসতেন। বাবা আসার আগে আলমারি বন্ধ করতেন। তার ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ হত। আর তারপরই বাবার পায়ের শব্দ। সেই ছেলেটি আর তার দাদা আবদুস সালাম তখন তড়িঘড়ি সব কাজ ফেলে হুমড়ি খেয়ে বইয়ের পাতার ওপর পড়ত। সবসময় তা যে পড়ার বই হত, তা নয়। কারণ বাবা উঁকি দিয়ে দেখতেন না তাঁর ছেলেটি কী বই পড়ছে। দুষ্টু ছেলের মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি গিজগিজ করত। কিন্তু পড়ার খুব নেশা ছিল। পড়ার বই নয়, গল্পের বই। বোঝাই যাচ্ছে, এই দুষ্টু ছেলেটিই আজকের নোবেল-বিজয়ী মুহাম্মদ ইউনূস। ছেলেটার অবিরত পড়ার খোরাক জোগাড় করা সম্ভব হচ্ছিল না। বই কেনা, ধার করা ছেড়ে সে বই চুরি পর্যন্ত করত! তাতেও তৃপ্তি নেই। তখন তার মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। সে শুকতারা পড়তে খুব ভালবাসত। তাতে নিয়মিত একটি প্রতিযোগিতা থাকত।

জিতলে বিনা পয়সায় গ্রাহক হওয়া যেত। পত্রিকায় বিজয়ী প্রতিযোগীদের নাম ছাপা হত। তাদের মধ্যে একজনের নাম বেছে সেদিনের ইউনূস লিখেছিল, 'আমি বিজয়ী প্রতিযোগী। আমার ঠিকানা বদল হয়েছে। এখন থেকে বক্সিরহাটে পত্রিকা পাঠালে বাধিত হব।' যখন শুকতারা কেনা আর সম্ভব হচ্ছে না, তখন এভাবেই সেদিনের ইউনূস দুষ্টুমি করে শুকতারা জোগাড় করত। বই চুরি যে মহৎ কর্ম, সে-কথা অনেকেই বলেছেন। ইউনূসও ছেলেবেলায় সেই মহৎ কর্মটি করতেন। শুকতারা নেওয়ার সময় ইউনূস পাশের দোকানের ঠিকানা দিয়েছিলেন। যাতে পত্রিকার সংখ্যা বাবার হাতে এসে না পড়ে। 'প্রতিমাসে আমরা সেই বিনামূল্যের সংখ্যার অপেক্ষায় বসে থাকতাম আর সেই পরিকল্পনা নিখুঁতভাবে স্বপ্নের মতো কাজ করেছিল। তাঁর যে উদ্ভাবনী ক্ষমতা, তা ছেলেবেলার দুষ্টুমিতেও ফুটে উঠেছিল। সৃজনশীল দুষ্টুমি!

তিনি যখন জোবরা গ্রামে কাজ করতে গেলেন, তখন তাঁর মধ্যে কাজ করেছিল সেই সৃজনশীলতা। তখন তিনি আমেরিকা-ফেরত। কয়েক বছর পড়ে ফিরে এসেছেন। বন্ধু আবদুস শেকুরের সঙ্গে দেখা। বছর পাঁচেক আগে যখন পড়তে গিয়েছিলেন, তখন কবজিতে বাঁধা ছিল বাবার দেওয়া ওয়েস্টএন্ড ঘড়ি। কালো চামড়ার ব্যান্ড। আবদুস জিজ্ঞেস করলেন, 'তুই একটি ঘড়িও কিনলি না?' ইউনূস বললেন, 'ওই ঘড়িটা চলছে ঘড়ি ঘড়ি, সময় দিচ্ছে ঠিক। তবে?' আমেরিকা গিয়ে চাকচিক্য তাঁকে টানেনি। সেই জন্যে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পর তিনি যখন বিশ্বব্যাঙ্কের প্রস্তাব পেলেন, তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি বলে দিয়েছিলেন, 'বিশ্বব্যাঙ্কের কাছে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক কোনও টাকা চাইছে না।' অনেক পীড়াপীড়িতেও তিনি বিশ্বব্যাঙ্কের টাকা ছুঁতে রাজি হননি। বলেছিলেন, 'যদি আমি গ্রামীণ ব্যাঙ্ক থেকে এ বিষয়ে আপত্তি না জানাই, তবে, আগামী কুড়ি বছর একটি টাকাও না নিলে বিশ্বব্যাঙ্কের দলিলে আমরা চিরকাল তাদের প্রদত্ত টাকার গ্রহীতা হিসেবে নথিভুক্ত হয়ে থাকব। বরাবর তারা আমাদের তাদের প্রোজেক্ট বলে চিহ্নিত করবে।' গ্রামীণ ব্যাঙ্ককে তিনি 'দাতার' ওপর নির্ভরশীল রাখেননি। আসলে ভিক্ষাবৃত্তিটাকেই তিনি দূরে রাখতে চেয়েছেন। জোবরা গ্রামে তিনি যখন প্রথম নিজের আমেরিকা-ফেরত সাতাশ ডলার দেন, তখন তার মধ্যে এক ভিক্ষুকও ছিল। তিনি কয়েকজনকে বেছেছিলেন। গ্রামীণ ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজার নূরজাহান বেগম আজ গল্পটা করছিলেন। নূরজাহান ছিলেন ভূগোলের অধ্যাপক। অধ্যাপক ইউনূস অর্থনীতির। তিনি চল্লিশ জনকে ভাগবাঁটোয়ারা করে দেবেন টাকাটা।

সোফিয়া ভিক্ষুক কিছুতেই সে টাকা নেবে না। তাকে বলা হয়েছিল, ওই টাকা দিয়ে তুমি কিছু জিনিস কেনো। শিমের দানা, কুমড়োর দানা, হাতের চুড়ি। যখন ভিক্ষে করতে যাবে, ভিক্ষে না নিয়ে ওইগুলো বিক্রি করবে। সোফিয়া চাইল দশ

নোবেল পাওয়ার পর ছোটদের অভিনন্দন।

টাকা। তার হাতে জোর করে তিরিশ টাকা গুঁজে দেওয়া হল। সেই সোফিয়া আজ একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। তখনও গ্রামীণ ব্যাঙ্ক হয়নি। জোবরা গ্রামের একটা চায়ের দোকানে অধ্যাপক ইউনূসের পকেটের টাকা ফেরত দেওয়ার নিয়ম ছিল। চল্লিশ জনই সেই টাকা চায়ের দোকানে এসে ফেরত দেয়। তখন তাঁর স্থির বিশ্বাস জন্মায়, গরিবরা টাকা ফেরত দেয়। কিন্তু বাংলাদেশের সনাতন ব্যাঙ্কগুলো তাঁর কথার ওপর ভরসা করেনি। সেটা এখন বোঝা যাচ্ছে যে ভালই হয়েছে। তখনই বাংলাদেশে এক অর্ডিনান্সের বলে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের স্থাপনা হল। প্রথমে চট্টগ্রাম, তারপর টাঙ্গাইল, রঙপুর, পটুয়াখালি, ঢাকা। ৫ জেলায় ধীরে ধীরে ব্যাঙ্ক ছড়াল। গ্রামীণ ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজার নূরজাহান বলছিলেন, 'আমরা ক্ষুদ্র ঋণের কাজের বাইরে সামাজিক সমস্যার সমাধানে নেমে পড়লাম। তাতেই গ্রামের অন্দরে আমরা ঢুকে পড়লাম। অন্দর থেকে অন্দরে। কোথায় কে ক্ষুদ্র ঋণের টাকায় গরু কিনেছে, আমাদের দুধ খাওয়াবে। কার তেঁতুলগাছে তেঁতুল ফলেছে, আমাদের দেবে। কিন্তু স্যারের নির্দেশে কোনও গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সদস্যের কাছে গিয়ে কিচ্ছুটি চাওয়া যাবে না। এমনকি খাওয়াও যাবে না। সেই ছিদ্র দিয়ে দুর্নীতি ঢুকে পড়বে। প্রথমে জিনিস, তারপর আরও জিনিস, তারপর...।' গ্রামীণ ব্যাঙ্ক বোধকরি আমাদের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিরল প্রতিষ্ঠান, যার গায়ে সততার সিলমোহর ঝকমক করে আঁটা আছে। সম্ভবত সততা আর সরলতার পথটা একই সরলরেখায় বিচরণ করে। তাঁর অফিস ঘরটা অতি সাধারণ। সরল। কোনও শীতাতপনিয়ন্ত্রিত যন্ত্র নেই। কাঠের চেয়ার। গ্রামীণ উদ্যোগের চেক-কাপড়ের ঝোলানো পর্দা। কোনও সোফা নেই। সহজ মানুষটির আজ বড় মনে পড়ছে ১৯৯৩ সালের কথা। বিশ্বব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট লুই প্রেস্টন তাঁকে ওয়াশিংটন ডিসি-তে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। বিশ্ব ক্ষুধা সম্মেলনে যোগ দিতে। কে ভাবতে পেরেছিল মিরপুরের মণিপুর বস্তির সামনে আমার অফিস। যে বস্তিতে ক্ষুধা-দারিদ্র্য। আর আমি বিশ্ব অর্থনীতির জগতের কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে আমাদের সাফল্য সম্পর্কে বক্তৃতা দেব! পাল্লা দেব বিশ্বব্যাঙ্কের সঙ্গে?

বিশ্বব্যাঙ্কের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া এত বড় যে-ব্যক্তিত্ব, তাঁর এখনও কিন্তু প্রিয় খাবার পেঁয়াজি আর ফুলুরি। ছোটবেলার স্মৃতি হাতড়ে তিনি বলেন, 'আমার প্রিয় খাবার ছিল আলুর চপ ও ভিনিগারে ভেজানো ভাজা পেঁয়াজের পুরভরা আলুর দম।' তিনি স্মৃতি খুঁড়লেই খুঁজে পান ছোটবেলার দুষ্টু ছেলেটাকে। 'বড়' হয়ে তিনি সে-সব অস্বীকার করেন না। তাঁর ছিল বড় ছবি তোলার শখ। ক্যামেরা কোথায় পাবেন? 'চট্টগ্রাম জেলায় বৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তি পাওয়ার সুবাদে মাসে মাসে কিছু টাকা আমার হাতে আসত। এই টাকার সঙ্গে বাকি টাকাটা আমি জোগাড় করতাম বাবার সরল বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে। বাবার সোনার দোকানে খুব ভিড়ের সময় কাছাকাছি থাকলেই সাহায্য করার জন্য আমার ডাক পড়ত। তাঁর খুচরো পয়সার

ড্রয়ার থেকে সে সময়ে আমি কিছু টাকা ও পয়সা সরাতাম। এই আত্মসাৎ প্রক্রিয়া কখনই মাত্রা ছাড়াত না।' এই টাকা দিয়ে তিনি ও তাঁর বড়দা মিলে একটা বক্স ক্যামেরা কিনেছিলেন। সেটা নিয়ে তাঁরা সর্বত্র ঘুরে বেড়াতেন।

কলকাতায় দুষ্টু ছেলেদের বাবা-মায়েরা অধ্যাপক ইউনূসের দুষ্টু বুদ্ধির কাহিনী পড়ে কিছুটা সান্ত্বনা লাভ করতে পারেন। অধ্যাপক ইউনূস পড়াশোনায় বরাবর ভাল ছিলেন। আমেরিকাতেও তিনি ভাল রেজাল্ট করেন। কিন্তু বাংলার বাবা-মায়েরা জেনে রাখুন অধ্যাপক ইউনূসের অভিন্ন হৃদয় বন্ধু আবদুস শেকুর জানিয়েছেন, অধ্যাপক ইউনূস বি এ এবং এম এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণী পান। তা-ও প্রথম নন। কারণ, বি এ পরীক্ষার সময় তিনি নানা বিষয় নিয়ে মেতে ওঠেন। বয়েজ স্কাউট হিসেবে বিদেশেও যান। এম এ (অর্থনীতি) পড়ার সময় তাঁর মাথায় প্যাকেজিং শিল্প ঢুকেছিল। তখন পূর্ব পাকিস্তানে জিনিস তৈরি হত। আর প্যাক হত পশ্চিমে। এতে তিনি ভাবলেন কী করে পূর্ব পাকিস্তানেই প্যাকেজিং শিল্পটাকে ভাল করে করা যায়। ব্যস, এম এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণী! সেই দ্বিতীয় শ্রেণী পাওয়া ছেলেটি আজ বাংলাদেশের নয়, সমস্ত বাঙালির কাছে প্রথম শ্রেণীর নাগরিক। আমেরিকায় পড়াশোনা করে তিনি অনায়াসে বিলাসবহুল জীবনযাপন করতে পারতেন। করেননি। বাংলার সীমা ডিঙোননি। বাংলায় থেকেই একসময়ের দুষ্টু ছেলে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে গেছেন। নাকি বিশ্বকে নিয়ে এসেছেন বাংলার দরবারে!

বাংলার দরবারে বিশ্বকে নিয়ে আসার কথা তিনি আর-পাঁচটা ছোট ছেলের মতো বা আর পাঁচটা ছাত্রের মতো কখনই ভাবতে পারেননি। ছোটবেলায় তাঁর সাধ ছিল সিলমোহর বানানোর। তিনি জমানো টাকা দিয়ে নিজের নামের রাবার স্ট্যাম্প বানিয়েছিলেন। আজ তাঁর গ্রামীণ ব্যাঙ্ক বিশ্বে একটা ব্র্যান্ড নাম। আর রাবার স্ট্যাম্প? তাঁর নামের ওপর পড়েছে সর্বোচ্চ পুরস্কারের সিলমোহর।

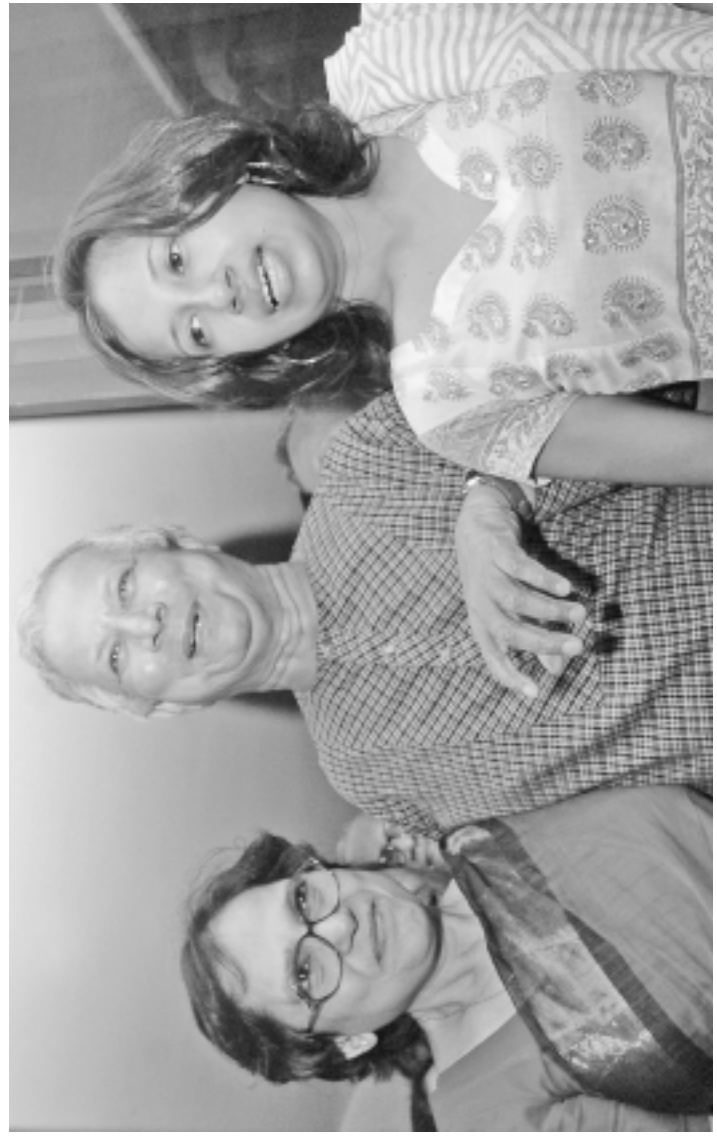

স্ত্রী আফরোজা ও মেয়ে দিনার সঙ্গে

পরিশিষ্ট-১

গ্রামীণ ব্যাঙ্ক: এক নজরে

- ✓ মোট গ্রাম যেখানে ব্যাঙ্ক উপস্থিত : ৭৩ হাজার ৬০৯
- ✓ শাখা ২২৮৩
- ✓ ঋণ দিয়েছে ২৯ হাজার কোটি টাকা
- ✓ ঋণ আদায়ের পরিমাণ ৯৮ শতাংশ
- ✓ গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সংখ্যা ১২০০
- ✓ কর্মচারী ১২ হাজারের বেশি
- ✓ ঋণগ্রহীতার ৪৬ শতাংশ দারিদ্র্যমুক্ত
- ✓ পাঁচজন করে যে গ্রুপ বা দল করা হয় তার সংখ্যা ১০ লক্ষ ৪০ হাজার
- ✓ বর্তমান সদস্যসংখ্যা ৬৬ লক্ষ
- ✓ মহিলা ৬৩ লক্ষ
- ✓ এই ব্যাঙ্কের ঋণগ্রহীতারা ৯৪.৩৪ শতাংশের মালিক, সরকার ৩.৭৮ শতাংশ, সোনালি ব্যাঙ্ক ০.৯৪ শতাংশ, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাঙ্ক ০.৯৪ শতাংশের মালিক
- ✓ ব্যাঙ্ক প্রতি বছর প্রায় পাঁচ হাজার কোটি টাকা ঋণ দেয়। সে টাকা আসে ব্যাঙ্কের আমানত থেকে
- ✓ ভিক্ষুক সদস্য ৭৮ হাজার ২২৯
- ✓ ভিক্ষুকদের দেওয়া হয়েছে ৭ কোটি ৬ লক্ষ টাকা
- ✓ বৃত্তি পেয়েছেন : ছাত্রী ১৯ হাজার ১০
  ছাত্র ১৩ হাজার ৪২৯

গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সদস্যদের সঙ্গে

পরিশিষ্ট-২

গ্রামীণ ব্যাঙ্কের নিয়ম

- সাপ্তাহিক কিস্তির মাধ্যমে ঋণ শোধ করতে হয়।
- ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পাওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে তা নির্দিষ্ট খাতে ব্যবহার করতে হয়। অন্য খাতে খরচ করা নিয়মবহির্ভূত।
- ঋণের টাকা শোধ না হওয়া পর্যন্ত ঋণের টাকায় কেনা যাবতীয় সম্পদ গ্রামীণ ব্যাঙ্কের নিজস্ব সম্পদ বলে বিবেচিত হয়।
- গ্রুপের সব সদস্যের সাপ্তাহিক সভায় উপস্থিতি, শৃঙ্খলাবোধ এবং কিস্তি শোধের নিয়মানুবর্তিতার ওপর গ্রুপের সঙ্গে ব্যাঙ্কের লেনদেনের সম্পর্ক নির্ভরশীল। সাপ্তাহিক সভায় নিয়মিত হাজির না হওয়া, কিস্তির টাকা কম দেওয়া এ-সব করলে গ্রুপ নিজেকে ক্রমশ অনুপযুক্ত করে তোলে বলে ব্যাঙ্কের ধারণা।
- গ্রুপের কোনও সদস্যের শৃঙ্খলাবিরোধী কাজের জন্য গ্রুপের অবশিষ্ট সদস্যরা তাঁর ওপর জরিমানা ধার্য করতে পারেন। সেই জরিমানার টাকা গ্রুপের সঞ্চয় ফান্ডে জমা পড়ে।
- গ্রুপের শৃঙ্খলাবিরোধী কাজের জন্য যে-কোনও সদস্যকে অবশিষ্ট সদস্যদের সম্মতিক্রমে বহিষ্কার করা যায়।
- ব্যাঙ্ক থেকে এক বছর মেয়াদের জন্য ঋণ পাওয়া যায়। ঋণ পরিশোধের জন্য সমান অঙ্কের সাপ্তাহিক কিস্তি দিতে হয়। ঋণ নেওয়ার এক সপ্তাহ পরেই ঋণ শোধের প্রথম কিস্তি শুরু হয়। সুদের হার কুড়ি শতাংশ। এক হাজার টাকা ঋণ নিয়ে এক বছরে পরিশোধ করে দিলে মোট দিতে হবে ১১০০ টাকা। অর্থাৎ অতিরিক্ত ১০০ টাকা। এক হাজার টাকা ঋণের জন্য প্রতি সপ্তাহে সুদ দিতে হয় দু'টাকা।
- উৎপাদনশীল কাজের জন্য ১০০০ টাকার বছর শেষে যে ১০০ টাকা সুদ তা ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতিতে নেওয়া হয়।
- গৃহ ঋণের জন্য সুদ আট শতাংশ।
- শিক্ষা ঋণের জন্য শিক্ষাকালে সুদ দিতে হয় না। শিক্ষা শেষে পাঁচ শতাংশ হারে সুদ দিতে হয়। ভিক্ষুকদের বিনা সুদে ঋণ দেওয়া হয়।
- অন্য দিকে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক আমানতকারীদের আমানতের ওপর ৮.৫০ শতাংশ থেকে ১২ শতাংশ পর্যন্ত চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ দেয়। গ্রামীণ ব্যাঙ্ক সরল হারে সুদ নির্ণয় করে। সুদের ওপর সুদ ধার্য হয় না।

পরিশিষ্ট-৩

দশ দিক

গ্রামীণ ব্যাঙ্ক সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নতি করে। গ্রামীণ ব্যাঙ্ক তখনই মনে করে কোন সদস্য দারিদ্র্যসীমার ওপরে উঠে এসেছে যখন সে নিচের দশটি মান পূরণ করে:

(১) ন্যূনতম ২৫ হাজার টাকার ঘরে বাস করে। অথবা তার ছাদের টিনের চাল আছে। পরিবারের প্রতিটি সদস্য মেঝেতে না শুয়ে বিছানায় শোয়।

(২) তারা যদি বিশুদ্ধ জল খায়। সে জল টিউবওয়েলের হতে পারে, ফোটানো জল হতে পারে। কিন্তু তা আর্সেনিকবিহীন ও বিশুদ্ধ হতে হবে।

(৩) ছ'বছরের বেশি বয়সী ছেলেমেয়ে স্কুলে যায় বা তাদের স্কুলের পড়া শেষ হয়েছে।

(৪) ঋণের সাপ্তাহিক কিস্তি ২০০ টাকা বা তার বেশি।

(৫) স্যানিটারি টয়লেটের ব্যবস্থা

(৬) পরার জন্য মোটামুটি জামাকাপড় আছে। শীতকালে গরম জামা, শাল, সোয়েটার, কম্বল ব্যবহার করে। মশারি আছে।

(৭) বাড়ির লাগোয়া জায়গায় শাকসবজি, ফলের গাছ আছে। তার থেকে প্রয়োজনে আরও করতে পারে।

(৮) বছরে ৫০০০ টাকা সঞ্চয় করে।

(৯) সারা বছরই পেট ভরে দিনে তিনবার খেতে পায়।

(১০) কারও শরীর খারাপ হলে ডাক্তারখানা বা হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারে, ওষুধ কিনতে পারে।

পরিশিষ্ট-৪

গ্রামীণ ব্যাঙ্ক অন্য যে-সব ক্ষেত্রে কাজ করছে

- গৃহ ঋণ ও উচ্চশিক্ষা:
  এ পর্যন্ত গ্রামীণ ব্যাঙ্কের গ্রামীণ গৃহায়ন ঋণ নিয়ে ৬ লক্ষ ৩৭ হাজার গৃহ সদস্যরা তৈরি করেছেন। সে-সব সদস্যের মধ্যে থেকে ১২ হাজার সন্তান উচ্চশিক্ষা লাভে ঋণ নিয়েছেন। এই ঋণের পরিমাণ ৩১ কোটি টাকা।
- গ্রামীণ ব্যাঙ্ক স্কলারশিপ বা বৃত্তি:
  গ্রামীণ ব্যাঙ্ক থেকে ৩১ হাজার সদস্য সন্তান বৃত্তি লাভ করেছে। এই টাকার পরিমাণ ২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা।
- কোম্পানি গড়ে তোলা:
  গ্রামীণ ব্যাঙ্ক গরিবের স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রায় ২০টির মতো কোম্পানি গড়ে তুলেছে। এ- সব কোম্পানি গরিবদের স্বাস্থ্য, মোটর বিদ্যুৎ সরবরাহ-সহ নানা ধরনের সামাজিক কাজ করে থাকে।
- পল্লী ফোন চালু:
  গ্রামীণ ব্যাঙ্কের মহিলা সদস্যদের মাধ্যমে আড়াই লক্ষের বেশি পল্লী ফোনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- ভাগ্যোন্নয়ন প্রকল্প:
  গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ৭৫ হাজার ভিক্ষুককে 'ভাগ্যোন্নয়নের' জন্য ৭ কোটি টাকার সুদমুক্ত ঋণের ব্যবস্থা করেছে।

পরিশিষ্ট-৫

- ১৯৮৪: র‍্যামন ম্যাগসাইসাই পুরস্কার, ফিলিপাইন। গ্রামের দরিদ্র নারী-পুরুষদের ঋণ দানের মাধ্যমে তাদের কর্মঠ করে তোলা এবং এই ঋণের মাধ্যমে উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করার পথ দেখানো।
- ১৯৮৯: আগা খান অ্যাওয়ার্ড ফর আর্কিটেকচার, সুইৎজারল্যান্ড
  গ্রামীণ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অবহেলিত মানুষদের ক্ষুদ্র ঋণ দান, কর্মঠ করে তোলা এবং উৎপাদন ব্যবস্থা গতিশীল রাখার জন্য জেনেভা-ভিত্তিক ফাউন্ডেশনের পুরস্কার।
- ১৯৯৩: মোহাম্মদ শাহাবদেন অ্যাওয়ার্ড ফর সায়েন্স, শ্রীলঙ্কা
  সামাজিক-অর্থনীতিতে বিশেষ অবদানের জন্য।
- ১৯৯৩: হিউম্যানিটেরিয়ান অ্যাওয়ার্ড, আমেরিকা।
  মানবতামূলক কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ আমেরিকা-ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান কেয়ারের পুরস্কার।
- ১৯৯৪: বিশ্ব খাদ্য পুরস্কার, আমেরিকা।
  তার প্রকল্পের কারণে বিশ্বের অসংখ্য দরিদ্র লোকজন বেঁচে থাকার শক্ত ভিত পায়। আমেরিকা-ভিত্তিক ওয়ার্ল্ড ফুড প্রাইজ ফাউন্ডেশনের পুরস্কার।
- ১৯৯৪: পিফেফার শান্তি পুরস্কার, আমেরিকা।
  ঋণ পাওয়া সব মানুষের অধিকার। অর্থনীতির ভাষায় এই মহান সত্যটি তিনি প্রতিষ্ঠা করেন।
- ১৯৯৬: আন্তর্জাতিক সিমোন বলিভার পুরস্কার, ভেনেজুয়েলা ও ইউনেস্কো।
  স্ট্রাম ফাউন্ডেশনের পুরস্কার।
- ১৯৯৭: হেলপ ফর সেলফ হেলপ প্রাইজ।
  নরওয়ে স্ট্রাম ফাউন্ডেশনের পুরস্কার।
- ১৯৯৭: ম্যান ফর পিস অ্যাওয়ার্ড, ইতালি।
  সিডনি পিস ফাউন্ডেশনের পুরস্কার।
- ১৯৯৮: অজাকি অ্যাওয়ার্ড, জাপান।
- ১৯৯৮: ইন্দিরা গান্ধী পুরস্কার, ভারত।
- ১৯৯৮: রথীন্দ্র পুরস্কার, ভারত। বিশ্বভারতী।
- ২০০১: গ্র্যান্ড প্রাইজ অফ দ্য ফুকুওকা এশিয়ান কালচারাল প্রাইজ, জাপান।

- ২০০১: হো চি মিন অ্যাওয়ার্ড, ভিয়েতনাম।
- ২০০২: মহাত্মা গান্ধী অ্যাওয়ার্ড, আমেরিকা।
  মহাত্মা গান্ধী ইনস্টিটিউট ফর নন-ভায়োলেন্সের পুরস্কার।
- ২০০৩: ভলভো পরিবেশ পুরস্কার, সুইডেন
- ২০০৪: দি ইকনমিস্ট ইনোভেশন পুরস্কার, আমেরিকা
- ২০০৫: ভ্যালেসয়ার জাস্টিস ফাউন্ডেশন, স্পেন
- ২০০৫: ফ্রিডম অ্যাওয়ার্ড, আমেরিকা
- ২০০৬: নিউস্ট্যাড অ্যাওয়ার্ড, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়, আমেরিকা।
- ২০০৬: গ্লোবাল সিটিজেন অফ দ্য ইয়ার অ্যাওয়ার্ড, আমেরিকা।
- ২০০৬: ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট ফ্রিডম অ্যাওয়ার্ড, নেদারল্যান্ড।
- ২০০৬: আই টি ইউ ওয়ার্ল্ড ইনফরমেশন সোসাইটি অ্যাওয়ার্ড, সুইৎজারল্যান্ড।
- ২০০৬: সিওল শান্তি পুরস্কার
  এ ছাড়া তিনি বাংলাদেশের অনেক পুরস্কার পান।
  অন্যান্য জায়গা থেকেও পান অনেক সম্মান।

* এই বইয়ে যেখানে টাকার কথা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে বাংলাদেশি মুদ্রা: টাকা।

* ছবি: জহিরুল হক, এ এফ পি, পি টি আই ও অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়